প্রচার।

মাসিক পত্র।

তৃতীয় খণ্ড। ১২৯৩-৯৪ সাল।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

৫ নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন হইতে

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

ও

১০ নং ওল্‌ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট

হেরাল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সূচী।

শাক্যসিংহের তপস্যা।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনানদীতীরে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত উৎকটতর তপস্যা করিযাছিলেন এবং অবিচ্ছেদে ৬ বৎসর তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিযাও তিনি নির্ব্বাণ বা স্বাভিমত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে বোধি-দ্রুম-তলে গমন পূর্ব্বক ধ্যানের অভিনব পথ উদ্ভাবন করতঃ কেবল ও বিশুদ্ধ নির্ব্বাণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইযাছিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যেরূপ উৎকট তপস্যা করিযাছিলেন, সেরূপ উৎকট তপস্যা কেহ কখন করিতে পারিযাছিলেন কি না সন্দেহ। বৌদ্ধেরা বলে, যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে এবং যাহারা আস্ফানক ধ্যান করিতে সমর্থ, তাহারাই কেবল তাদৃশ দুশ্চর তপস্যা করিতে পারে, অন্যে পারে না। (আস্ফানক ধ্যান কি তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।)

বুদ্ধদেব শিষ্যগণের নিকট বলিযাছিলেন—"শিষ্যগণ! আমি ইহলোকে অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রকারগণের দর্পবিঘাতের জন্য, পরপ্রবাদীদিগকে নিগ্রহ করিবার জন্য, কর্ম্মক্রিযাপবিত্যাগীদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, পুণ্য উদ্ভাবনের জন্য, জ্ঞানবল লাভের জন্য, বুদ্ধ-জ্ঞান সাক্ষাৎকারের জন্য, ধ্যানের অঙ্গবিভাগ স্থির করিবার জন্য, চিত্তের স্থিরতা ও মনের প্রভূত বল উৎপাদনের জন্য তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিযাছিলাম*।" বুদ্ধের এই কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধদেব তপস্যাকে সফল বলিয়া জানিতেন বা মনে করিতেন, এবং তপস্যা করিলে যে ঐ সকল ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

হিন্দুদিগের পুরাণাদি-শাস্ত্রে ঋষিমুনিদিগের যেরূপ দুশ্চর তপস্যাপ্রণালী দেখা যায়, শাক্যসিংহের তপস্যাপ্রণালীও প্রায় সেইরূপ, পরন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত পূর্ব্ব মুনিদিগের উদ্দেশ্যের একরূপতা ছিল কি না সন্দেহ। শাক্যসিংহের তপস্যা আর পূর্ব্ব মুনিগণের তপস্যা উদ্দেশ্যবিষয়ে ভেদ

---

* ললিতবিস্তরের ১৭ অধ্যায দেখ।

থাকাতেই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু মাত্র বিভিন্নতা দেখা যায় না।

শাক্যসিংহের তপস্যা কিরূপ? তিনি কি প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণিত হইতেছে। তদ্ যথা—

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাক্যসিংহ বুদ্ধসংকল্পধারণ ও প্রবল উৎসাহ আহরণ পূর্ব্বক নৈরঞ্জনাতীরে তৃণময় ভূমিতে যোগাসন ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রবলবল চিত্তের দ্বারা স্বকীয় শরীরনিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন *। যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক নিষ্পীড়িত করে, ভগবান্ শাক্যসিংহ তদ্রূপ ইচ্ছাবেগসমুদ্দীপিত প্রবলবল চিত্তের দ্বারা শরীরকে নিষ্পীড়িত বা নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। শরীরক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই নিষ্পীড়িত হইতে লাগিল, নিরুদ্ধ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্মনিস্রাব হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতকাল, বিশেষতঃ রাত্রি, তাহাতে আবার নিরাচ্ছাদিত নদীতীর—তথাপি তাঁহার দেহে ঘর্ম্মস্রোত বহিল †।

নিগ্রহযোগ আয়ত্ত হইলে শাক্যসিংহ ভাবিলেন, এখন আমি আস্ফানক ধ্যান করিব। কুম্ভকযোগে মনোবৃত্তির লয় করার অথবা বাহ্য চৈতন্য হরণ করার নাম আস্ফানক ধ্যান। এই ধ্যানের কোনরূপ অবলম্বন নাই সুতরাং ইহা নিরালম্ব-ধ্যান। শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনোবৃত্তির অনুত্থান করতঃ এই ধ্যান নিষ্পন্ন করিতে হয়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, "আশ্বাসপ্রশ্বাসানুরূপবোধয়তি—সন্নিবোধয়তি। অকম্পং তদ্ধ্যানং অবিকম্পমনিঙ্গনমপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানিঃসৃতম্।" আস্ফানক-ধ্যানে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয়; এ ধ্যান নিষ্কম্প, নিশ্চল নিস্পন্দ, সর্ব্বানুগত ও সর্ব্বত্র অনিঃসৃত অর্থাৎ পূর্ণ। "আকাশসমং তদ্ধ্যানং তেন চোচ্যতে আস্ফানকমিতি।" এই ধ্যান আকাশের ন্যায় অর্থাৎ আকাশে

* অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

† আমাদের যোগশাস্ত্রে যাহাকে শম-দম-সাধন বলে, বৌদ্ধেরা তাহাকে শরীরনিগ্রহ বলে। শাক্যসিংহ কয়েক মাস ব্যাপিয়া এই নিগ্রহ সাধন করিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধি লাভও করিলেন।

স্ফুরণ যদ্রূপ, ইহাতে চিত্তের অবস্থা তদ্রূপ *। অনন্তর আস্ফানক ধ্যান অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মুখ-নাসিকার বায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইল। মুখনাসিকাপথ অবরুদ্ধ হইলে শরীরে কুম্ভবৎ পরিপূর্ণ বাহ্য বায়ু প্রবলবেগে মহাশব্দে কর্ণছিদ্র দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনি পুনরপি আস্ফানক ধ্যান অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ কুম্ভিত বায়ু যাহাতে কর্ণপথে না যায় তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেন। এই দ্বিতীয় আস্ফানক ধ্যানে তাঁহার মুখ, নাসিকা, শ্রোত্র, সমস্তই রুদ্ধ হইল। কুম্ভিত বায়ু তখন ঊর্দ্ধগামী হইয়া তাঁহার শিরঃকপালে গিয়া (মাথার খুলির অভ্যন্তর ভাগে গিয়া) আঘাত করিল। এই তৃতীয় উদ্ঘাত কালে তাঁহার কুণ্ডলী (চেতনা শক্তি) শিরঃকপালে অর্থাৎ চিত্তস্থানে (মস্তিষ্কে) গিয়া একীভূত বা বিলয়প্রাপ্ত হইল। এখন তিনি নিশ্চল, নিস্পন্দ †। বুদ্ধদেবের এই কুম্ভকসমাপ্তি লিখিতে গিয়া আর্যযোগীর নিম্নলিখিত কথা মনে পড়ে।—

" যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধি সময়ে
শুদ্ধং বিয়ৎ সন্নিভম্ " ইত্যাদি।

এই সময়ে কোন কোন দর্শক লোক তাঁহাকে মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলে, এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থেও লিখিত আছে, এই দিবসের অর্দ্ধরাত্র সময়ে বুদ্ধমাতা মায়া দেবী স্বর্গ হইতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তিনিও রোদন করিয়াছিলেন। তদ্ যথা—

"যদা জাতোঽসি মে পুত্র ! বনে লুম্বিনিসাহ্বয়ে।
সিংহবচ্চাগৃহীত স্ত্বং ক্রান্তঃ সপ্ত পদান্ স্বয়ম্ ॥
দিশশ্চালোক্য চতুরো বাচা তে ব্যাহৃতা শুভা।
ইয়ং মে পশ্চিমা জাতিঃ সা তে ন পরিপূরিতা ॥
অসিতেনাভিনির্দ্দিষ্টো বুদ্ধোলোকে ভবিষ্যতি।
ক্ষুন্নং ব্যাকরণং তস্য ন দৃষ্টা তেন নিত্যতা ॥

* আমাদের যোগ শাস্ত্রে ইহাকে কুম্ভক-সমাধি বলে।

† "তদ্ যথাপি নাম ভিক্ষব পুরুষঃ কুণ্ডযা শক্ত্যা শিরঃ কপাল মুপহন্যাৎ। ইত্যাদি। লং। কেহ কেহ কুণ্ড শব্দের মৃৎপাত্র অর্থ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। "যেমন কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক মস্তকে কুণ্ডাঘাত করে, অবরুদ্ধ বায়ুও সেইরূপ আঘাত করিল।"

চক্রবর্ত্তিশ্রিযং পুত্র। নাপি ভুক্তা মনোরমা।
ন চ বোধিমনুপ্রাপ্তা জাতোহসি নিধনং বনে॥
পুত্রার্থে কং প্রপদ্যামি কস্য ক্রন্দামি দুঃখিতা।
* * * *॥

পুত্র! তুমি যখন লুম্বিনি-বনে জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি সিংহবিক্রমে সপ্ত পদ গমন করিয়াছিলে। চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলে, এই আমার শেষ জন্ম, আর আমি জন্মগ্রহণ করিব না। কিন্তু হায়! তোমার সে বাক্য সফল হইল না। অসিত মুনি বলিয়াছিলেন, তুমি বুদ্ধ হইবে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, সেই ঋষিবাক্য মিথ্যা হইল। পুত্র! তুমি মনোরম রাজশ্রী ভোগ করিলে না, বুদ্ধও হইলে না। বনে জন্মিয়াছিলে এবং বনেই নিধনপ্রাপ্ত হইলে। এখন আমি পুত্র বলিয়া কাহার নিকট যাইব, কাহার নিকটেই বা কাঁদিব।

রোদনশব্দে বুদ্ধের যোগ ভঙ্গ হইল। নেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন, এক দিব্যরূপা নারী রোদন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কৈষাতীব করুণং রুদতে
প্রকীর্ণকেশী চ বিবৃত্তশোভা।
পুত্রং হ্যতীব পরিদেবযন্তী
বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা॥"

কে তুমি আলুলায়িতকেশী ও দুঃখে অশোভমানা হইয়া অত্যন্ত করুণ বিলাপ করিতেছ? পুত্র পুত্র বলিয়া রোদন করিতেছ? আর ধুল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছ?

মায়াদেবী প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"ময়া তু দশ মাসান্ বৈ কুক্ষৌ বজ্র ইব ধৃতঃ।
সা তেহহং পুত্রকা মাতা বিলপামি সুদুঃখিতা॥"

পুত্র! আমি তোমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, আমি তোমার মাতা। অতি দুঃখে বিলাপ করিতেছি!

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দয়ার্দ্র হইলেন এবং আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করিলেন।

বলিলেন, "ন ভেত্তব্যম্। শ্রমং তে সফলং করিষ্যামি।" ভয় নাই—আমি আপনার কষ্ট দূর করিব। অসিত মুনির বাক্য মিথ্যা হইবে না—নিশ্চিত আমি বুদ্ধ হইব।

"অপি শতধা বসুধা বিকীর্য্যতঃ
মেরুঃ প্লবে চাম্ভসি বস্ত্র শৃঙ্গঃ।
চন্দ্রার্ক তারাগণ ভূপতেত
পৃথগ্ জনো নৈব অহং মিয়েঽহম্॥"

যদি পৃথিবী শতধা বিকীর্ণ হয়, সুমেরু পর্ব্বত জলে প্লবমান হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা ভূপতিত হয়, তথাপি আমি প্রাকৃত মানুষের ন্যায় মরিব না।

আপনি শোক করিবেন না, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, শীঘ্রই দেখিবেন, আমি বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব দুঃখিনী জননীকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন, এবং মায়াদেবীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া অপ্সরোগণ সহ পুনর্ব্বার তুষিতপুরে গমন করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইল। একদা শাক্যসিংহের মনে হইল, ব্রাহ্মণগণ ও যতিগণ বলিয়া থাকেন, অল্পাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, অতএব আমিও অল্পাহার আশ্রয় করিব। অনন্তর তিনি কোন দিন একটী মাত্র কোলফল, একটী মাত্র তিল, কখন একটী তণ্ডুল কখন বা বারিমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অহরহ ও নিরন্তর আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, তথাপি ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না এবং আহার গ্রহণও করিলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহার মনে হইল, শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অনাহার দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন, অতএব আমিও অনাহার-ব্রত অবলম্বন করিব। পরে অনাহার-ব্রতেও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়ে তাঁহার শরীর এত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র কয়েক খানি শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার শরীরে পরিদৃশ্য হইত না এবং ঈদৃক্ অবস্থাতেও তিনি ধ্যানচ্যুত হন নাই।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভের

প্রত্যাশায় ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অল্পাশন ও অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া নিরন্ত-কাল অচলবৎ, স্থিরবৎ, স্থাণুবৎ ও নিস্পন্দ জড়বস্তুবৎ স্থিরভাবে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন। শত শত শীত, বাত, আতপ, বর্ষা, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বজ্র,—তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তত্তদ্বিষয়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হয় নাই। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একাসনে কাল কর্ত্তন করিয়াছিলেন, একদিনও ভাল করিয়া জানু প্রসারণ করেন নাই। তাঁহার শরীর এত নির্ম্মাংস কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, একগাছি তৃণ বা কার্পাসসূত্র তাঁহার নাসা দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া কর্ণ দিয়া বাহির করা যাইত এবং কর্ণ দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া মুখদিয়া বাহির করা যাইত। তাঁহার আকার এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশুপিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৌতুক করিত। তাদৃক্ কঠোর সাধনে তাঁহার কাঞ্চননিভ কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল। শরীরের রক্তমাংস শুকাইয়া গিয়াছিল। নয়ন কঠোর মগ্ন, কণ্ঠা বহির্গত, পঞ্জর দৃশ্যমান্ এবং মেরুদণ্ড উত্থিত হইয়াছিল। যখন ছয় বৎসর পূর্ণ হয়, তখন আর তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না।

ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে রাজা শুদ্ধোদন চার-পুরুষের দ্বারা শাক্যসিংহের এই তপোবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং তাঁহার পরিদর্শনার্থ লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এই সময়ে কামাধিপতি মার তাহাকে তপস্যা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নিম্নলিখিত প্রকারে প্রলোভিত করিয়াছিল। যথা—

"শাক্যপুত্র। সমুত্তিষ্ঠ কায়খেদেন কিং তব।
জীবতো জীবিতং শ্রেয়ো জীবন্ ধর্ম্ম চরিষ্যমি॥
কৃশো বিবর্ণোদীনস্ত্বংঅন্তিকে মরণং তব।
সহস্রভাগে মরণং এক ভাগে চ জীবিতম্॥
দুঃখোমার্গঃ প্রহাণস্য দুস্করশ্চিত্তনিগ্রহঃ।
ইমাং বাচং তদা মারো বোধিসত্ত্বমথাব্রবীৎ॥"

জ্ঞানবীর শাক্যসিংহ কামের ঈদৃক্ প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ আহরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিযাছিলেন,—

" প্রমত্তবন্ধো, পাপীয়াং স্বেনার্থেন ত্বমাগতঃ।
অণুমাত্রং হি মে পুণ্যৈবর্থো মার! ন বিদ্যতে॥
অর্থো যেষাস্তু পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি॥"

ইত্যাদি।

প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু অরে পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতেই আসিযাছিস্। আমি পুণ্যপ্রার্থী নহি; যে পুণ্য কামনা করে, তাহাকে গিযা তুই ঐ সকল কথা বল্। তুই আমার মরণের কথা বলিতেছিস কিন্তু আমি মরণ মানি না; কেন না, মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর কথা শুনিব না, ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব। সমাহিত ব্যক্তির শরীর শুষ্ক হইলে মাংস শুষ্ক হয়, মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রজ্ঞা জন্মে, প্রজ্ঞা জন্মিলে অতিশক্তিভাক্ উৎসাহ জন্মে, তদ্বলে তখন সমাধি প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। আমিও ঐরূপে তপস্যা করিব এবং সর্ব্বোত্তম বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব *।

এইরূপে তিনি কামকে পরাভূত করিলেন; কাম প্রতিগমন করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

" নায়ং মার্গোবোধের্যং মার্গো আযত্যাং জাতিজরামরণসম্ভবানামস্তঙ্গমায।" আমি যাহা করিতেছি, ইহা (এই আস্ফানক ধ্যান) বোধি-লাভের পথ নহে, সুতরাং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ-নিবারণের উপাযও নহে। পরে এই ভাব মনে উঠিল যে, " যোঽহং পিতুরুদ্যানে জম্বুচ্ছাযাযাং নিষণ্ণো বিবিক্তং কামৈর্বিবিক্তং পাপকৈরকুশলৈর্ধর্ম্মৈঃ সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং

* কোন এক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইযা শীঘ্র লক্ষ্য লাভ না হইলে মনের নানা প্রকার লক্ষ্যবিপর্য্যযকারী আন্দোলিতাবস্থা জন্মে, অর্থাৎ কষ্ট করিতে ইচ্ছা হয না। সেই সকল আন্দোলনের নাম কাম বা সুখপ্রলোভন। শাক্যসিংহের মনে চকিতের ন্যায ঐরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইযাছিল কিন্তু তিনি তাহা বিক্রমদ্বারা দূরীকৃত করিয়াছিলেন।

প্রীতি সুখং প্রথমং ধ্যানং উপসম্পদ্য যাবৎ চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য ব্যহার্ষং স্যাৎ স মার্গো বোধের্জাতিজরামরণদুঃখ সমুদায়ানামসত্তবায়াস্তংগমায়।” পূর্ব্বে আমি যে পিতার উদ্যানে জম্বুবৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া কামমুক্ত, পাপমুক্ত ও অকুশলধর্ম্মবর্জ্জিত হইযা বিবেকজাত সবিতর্ক ও সবিচার নামক প্রথম সমাধি করিতাম, পরে চতুর্থধ্যানে অর্থাৎ নির্বীজ সমাধিতে বিহার করিতাম, তাহাই বোধিলাভের, নির্ব্বাপকজ্ঞান লাভের, ভবিষ্যৎ-জন্ম-জরা-মরণ-বিনাশের পথ বা উপায। কিন্তু, সে পথ এরূপ দুর্ব্বল শরীরের গন্তব্য নহে, প্রাপ্যও নহে। এ শরীরে আমি বোধিদ্রুম-তলে যাইতে অক্ষম। এজন্য, এক্ষণে আমার ঔদরিক আহার দ্বারা অগ্রে বলসঞ্চার করা আবশ্যক হইয়াছে। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে ডাকিযা বলিলেন, আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিব। পরে প্রথম দিনে তিনি মুদ্গযূষ পান করিলেন, অনন্তর দিবসে কুল্মাষযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

তাঁহার সেই শিষ্যপঞ্চক শাক্যসিংহের তাদৃশ আহারতৎপরতা দেখিযা ভাবিল, এই গৌতম ছয় বৎসর কাল এত কঠোর তপস্যা করিয়াও মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার। করিতে পারিল না। এক্ষণে এ ঔদরিক হইল, এখন আর এই ঔদরিকের নিকটে থাকিযা ফল কি? এটা নিতান্তই বালক, সুখপ্রসক্ত ও কপট। এইরূপ চিন্তা করিযা সেই শিষ্যপঞ্চক তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীগমন করিল, এবং তত্রস্থ মৃগদায় ও ঋষিপত্তন নামক স্থানে গিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল।

উরুবিল্বের নিকটে নন্দিক নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের অধিপতির একটী কন্যা ছিল। কন্যাটীর নাম সুজাতা। সুজাতা অতিশয সাধ্বী, ব্রতপরাযণা ও পতিব্রতা। সাধু সন্ন্যাসী ও শ্রমণদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। এমন কি তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই সুজাতা, যে দিন শুনিয়াছিল, নৈরঞ্জনাতীরে এক জন পরম তপস্বী আসিযাছেন, সেই হইতেই তিনি প্রতিদিন নিজ সখিগণসহ এই নব সন্ন্যাসীর সেবা ও বন্দনা করিতে নৈরঞ্জনাতীরে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য অনেক কন্যা আসিত। শাক্যসিংহ যখন কেবল মাত্র তিল, তণ্ডুল ও কোল ফল ভক্ষণ করিতেন,

তখন এই সুজাতাই তাঁহাকে ঐ সকল খাদ্য উপস্থিত করিয়া দিত। এক্ষণে এই সুজাতাই আবার তাঁহাকে মুদ্গযূষ ও অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। সুজাতার প্রদত্ত অন্নভোজনে ক্রমে তাঁহার দেহে পূর্ব্ববৎ বল-বর্ণাদি আগমন করিল। শরীরে বলসঞ্চার হইলে, তিনি আর সুজাতার আনীত ভক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, নিকটবর্ত্তী গোবর গ্রামে গিয়া অন্নভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আহারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন দেখিলেন, তাঁহার পরিধেয় কাষায় বসন ছয় বৎসরের বর্ষায় একবারে গলিত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বস্ত্র আহরণের ইচ্ছা জন্মিল। পূর্ব্বোক্ত সুজাতার রাধানাম্নী এক দাসী ছিল, সে মৃতা হওয়ায় তাহার বস্ত্রবেষ্টিত শবদেহ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত ছিল। শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া সেই শবস্পৃষ্ট বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং পুষ্করিণীজলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিধান করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া শুভদিনে ও শুভক্ষণে নৈরঞ্জনাজলে অবগাহন পূর্ব্বক শুচি ও শীতল হইয়া বোধিজ্ঞান উপার্জ্জনের উদ্দেশে বোধিবৃক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিলেন *।

শ্রীরামদাস সেন।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস।

অনুক্রমণিকা।

কলিকাতা বঙ্গদেশের ষষ্ঠ রাজধানী। বিগত ছয় শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালীকে আরও পাঁচটি রাজধানীর মুখাবলোকন করিতে হইয়াছে। সময়ক্রমে একে একে গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার শাসন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

---

* ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান বলিষ্ঠ হইলে নন্দিকগ্রামপতিদুহিতা সুজাতা একদিন তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ ও স্বগৃহে আহ্বান করিয়াছিল এবং ভগবান্ও তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সুজাতার গৃহে একদিন ভোজন করিয়াছিলেন।

২৫০০ বৎসর পুর্ব্বে গৌড় দশ লক্ষ লোকের আবাসভূমি ছিল। নগরের নিম্নে যে নদী প্রবাহিত ছিল, কালক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে উহা মন্দস্রোত ও ভিন্নশাখাগামী হইলে স্থানীয় স্বাস্থের ভয়ঙ্কর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। লোমহর্ষণ মহামারি আবির্ভূত হইয়া সমৃদ্ধিশালী রাজধানীকে অরণ্যে পরিণত করিল। কলিকাতার ন্যায় একদিন গৌড়ের বিচিত্রগঠনসম্পন্ন সৌধমালা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। সেই অট্টালিকাশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ এখন পুরাবৃত্তানুরাগীর কৌতূহলের সামগ্রী। "শত রাজার রাজধানী" রাজমহল গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের শীর্ষস্থানে সন্নিবেশিত। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন যদি শিল্পচাতুর্য্যে ইউরোপের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ এবং রোমের সহিত কোনও রূপে সংসৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে, হয় ত বাঙ্গালার ইতিহাস অন্য রূপে লিখিত হইত। নবদ্বীপ সাধারণত নদীয়া বলিয়া খ্যাত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শাস্ত্রচর্চ্চায় নবদ্বীপ বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। হিন্দুস্বাধীনতাসূর্য্য এই স্থানেই অস্তমিত হয়। মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার মুসলমান রাজধানী।

কলিকাতা একটি সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে আজি কয় বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর মহানগর সমূহের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। এত অল্পকাল মধ্যে সভ্য জগতে রুস রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ ব্যতীত আর কোনও স্থান সামান্য হইতে এত সমুন্নত হয় নাই। জব্ চার্ণক কর্তৃক কলিকাতার ভিত্তিমূল সংস্থাপনের সমকালেই সম্রাট্‌মহান্ পিটর সেণ্টপিটর্সবর্গের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। উভয় নগরই অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, আবার উভয়ই কালক্রমে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইল। শতাব্দীমাত্র অতীত না হইতেই আংলো ইণ্ডিয়া (ইঙ্গরেজাধিকৃত ভারত) ও রুষ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে এতদূর ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে তাহা তখন কেহ ভাবে নাই। একদিকে ভারতে সিপাহিরা যে কার্য্য সংসাধিত করিয়াছে, অপর দিকে মধ্য আসিয়ার কসাক সৈন্যগণও ঠিক সেইরূপ কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছিল।

কলিকাতার সন্নিবেশ স্থান—ভাগীরথী-তীরে সমতল ধান্যক্ষেত্র, জলাভূমি এবং স্থানে স্থানে বন ও জঙ্গল পরিবেষ্টিত তৃণপত্রাচ্ছাদিত মৃন্ময় গৃহসমষ্টির পল্লীমাত্র ছিল। প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার মহত্ত্বের ভিত্তিমূল এক শত

বৎসরের কিছু পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যদিও এই স্থানের সহিত প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু সম্বন্ধ আছে, তথাপি এই নগর সম্বন্ধীয় যে সকল স্থানীয় ও ঐতিহাসিক মনোহারিতা ছিল, তাহা প্রায় উপরি উক্ত সময়ের মধ্যে নিহিত। কলিকাতার ক্রমশঃ যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল ঐতিহাসিক মনোহারিতার স্মৃতি লোকের মন হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে এবং পুরাতন ভূমির ও স্থানের চিহ্নসকল পরিবর্ত্তনের স্রোতে যেমন ভাসিয়া যাইতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছে। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তুলনা করিলে, নগর-পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি কলিকাতা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কলিকাতা নগরের মহত্ত্ব যে ইঙ্গরেজ অধিকারের পর হইতেই হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে "প্রাচীন কলিকাতা" বলিলে সার্দ্ধেক শত বৎসরের একটি নগরকে বুঝায় মাত্র। অনেকে এজন্য ইহাকে প্রাচীন বলিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা এই মাত্র বলি যে, ভারতে ব্রিটিসদিগের সম্বন্ধে এই রূপই ঘটিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক ঘটনাস্রোত চলিয়া গিয়াছে এবং দৃশ্য সমূহের ঘন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃগণেরও এত দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে সেই ঘটনানিচয় আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের (United States) ন্যায় নবীন কলিকাতাকেও প্রাচীন করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ কলিকাতার পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তৃগণের কথা যেন সোমনাথ পত্তনের মুসলমান আক্রমণ অথবা সেকেন্দর বাদসাহের পাটলি-পুত্রাভিমুখে গমনের ন্যায় অতি পুরাতন ঘটনা বলিয়া অনুমিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম অধ্যায়।—ভূতত্ত্ব।

ভূতত্ত্ব বিষয়ক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা জল দ্বারা সঞ্চিত মৃত্তিকাসম্ভূত নিম্ন ও সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত, কেবল মাত্র জোয়ার সমতল হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত এবং নিকটবর্ত্তী রাজমহল পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে এক শত ক্রোশ দূরে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের নিম্নাংশে সন্নিবেশিত।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণা ও গণনা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে অতীব প্রাচীন অর্থাৎ ইতিহাসাতীত কালে, কলিকাতার ৭৫ ক্রোশ উত্তরে, মুরসিদাবাদ এবং মালদহের মধ্যস্থিত কোন একটী স্থানে সমুদ্রের তীর ছিল, এবং তথা হইতে ১৫ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত নির্ঝর-শোভিত উন্নতশেখর হিমালয-নিস্থতা কলনিনাদিনী তরঙ্গিণী সগর্ব্বে সাগর-গর্ভে কর্দ্দম (পলি) নিক্ষেপ করতঃ ক্রমশঃ নিম্ন বঙ্গ রচনা করিয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়মে ভূভেদ বা খনন *।—১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্বানুসন্ধানোপলক্ষে উইলিযাম দুর্গে যেএকটী সুগভীর কূপ খনন করা হয়, তৎসম্বন্ধীয় সভার মন্তব্য-সার পাঠে অবগত হওয়া যায, যে উহার ৩৯২ ফুট নিম্নস্তরে বালুকা মধ্যে গিরিনদী-গর্ভ-সুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গার (fine coal) কতক গুলি জীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত পাওয়া যায; এবং ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে এক খণ্ড চূর্ণ-প্রস্তর (Lime stone) উত্তোলিত হয়। ৪০০ হইতে ৪৮১ ফুট নিম্নস্তর সমূহের মধ্যে সমুদ্রোপকূল জাত সূক্ষ্ম সিকতা বিজড়িত অধিকাংশ আদি প্রস্তর (Primary socks) কোয়ার্টজ (quartz), ফেলস্পার (felspar), অভ্র (mica), শ্লেট (slate), এবং চূর্ণপ্রস্তরখণ্ড-মিশ্রিত উপলখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায। বিঘ্নসংঘটন প্রযুক্ত উপরিউক্ত নিম্ন তলই খনন কার্য্যের শেষ সীমা হয। এই রূপ (course conglomerate) দ্রব্যাদি যে কত দূর নিম্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তাহা ঠিক নির্ণয় হয নাই, কিন্তু অনুমিত হয যে উহা প্রায আর ৮০ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপরি উক্ত কারণ সমূহের দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয যে ইহার সন্নিকটে যে সকল উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ছিল সেই সকল ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বসিযা যায। ভূতত্ত্বানুসন্ধানে অনেক স্থলে সমভূমির নিম্ন ভূমধ্যস্তরে স্বভাবতঃ এই রূপ দ্রব্যাদি পাওয়া গিযা থাকে, সেই কারণ বশতঃ এই অনুমান সপ্রমাণিত হইতেছে। এই রূপ ৮০ ফুট নিম্নে একটী উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর (stratum of peat)

---

* Boring Operations in Fort William, 1835-40, *vide* Journal of the Asiatic Society, Bengal, Vol. IX. p. 686.

পাওযা যায়, উহাব মধ্যে মাদ্রাজী সসাব (cucumis madraspatamus. Wildenow) বীজ এবং এক জাতীয় ইক্ষুপত্র (leaves of sugar grass) (saccharum sara Roxburgh) প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার হুকাব বলেন যে, যে সময়ে স্রোতঃপ্রবাহিত কর্দ্দমবাশি (পলি) দ্বাবায় প্রথম স্থল বচিত হয় সেই সময়েব কলিকাতায সমতল ভূমিব উপরিভাগের সঙ্গে বর্ত্তমান সমভূমিব অবস্থাব বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়, এবং উহা দ্বারা অবগত হওয়া যায যে সেই সময়ে এই স্থানেব সমুদ্র খাড়ি (estuary) অনেক পবিমাণে টাটকা ছিল *। ১৫৯ ফুট নিম্নে এক প্রকাব পীত বর্ণ শিরাযুক্ত অাঁটাল মাটি, এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে লৌহমিশ্রিত মৃত্তিকা পাওয়া যায। ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিম্ন হইতে প্রস্তবে পবিণত অস্থি (fossil bone) উত্তোলিত হয়, উহা কুক্কুবেব স্কন্ধদেশেব অস্থি বলিযা অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত ৩৭২ ফুট নিম্নে অন্যান্য অস্থি সকলও পাওযা যায়।

শেযালদহ ষ্টেশনেব নিকট পুষ্করিণী খনন।—সারকুলাব বোডেব পূর্ব্বাংশে শেয়ালদহ ষ্টেসনের সীমাব মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহাব খনন সম্বন্ধে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব এসিযাটিক সোসাইটীর জর্নেলে যাহা উল্লেখ কবিযাছেন তদ্দ্বারাও আমরা কলিকাতার ভূতত্ত্ব বিষযে অনেক অবগত হইতে পাবি।

যে সময়ে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব উক্ত বিষয লিপিবদ্ধ কবেন সে সময়ে ঐ পুষ্করিণী ভূমিব স্বাভাবিক সমতল হইতে ৩০ ফুট নীচে পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল। ঐ সমতল ভূমি উক্ত পুষ্করিণীর নিকটস্থ খালেব স্বল্প-জোয়ার (low spring tide) সমতল হইতে ১৫½ ফুট নিম্ন; এবং উক্ত সমতল ভূমি গ্রীষ্মকালীন ভাগীবথীব অত্যল্প-জোযাব (lowest spring tide) সমতল হইতে ১৭ ফুট উচ্চ, সুতবাং পুষ্করিণীব তলদেশ উক্ত জোযার সমতল হইতে ১৩ ফুট নিম্নে। পূর্ব্বতন ভূপৃষ্ঠেব প্রমাণ সম্বন্ধে উপবি উক্ত বিষয়টী নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ঐ পুষ্করিণী খনন কালে দেখা যায যে, উহার উপরিস্থ ন্যূনাধিক ৩ ফুট

---

* *Vide* Himalayan Journal, Vol. II, p. 341.

ভূমি উদ্ভিদসমুদ্ভূত মৃত্তিকা ও প্রস্তুত মৃত্তিকায (made earth) পূর্ণ এবং অসমতল মৃত্তিকাব উপর স্থাপিত। ঐ নিম্নস্থ অসমতল ভূমিব মৃত্তিকা ধান্য-ক্ষেত্রেব মৃত্তিকার ন্যায; কিন্তু পুষ্করিণীব সকল স্থান একরূপ নহে। স্থল বিশেষ স্বল্পভাবাসহিষ্ণু বালুকাকণাবিমিশ্রিত লবণাক্ত কর্দ্দম যুক্ত, অন্যত্র বা পবিষ্কাব (ঘটাদি নির্ম্মাণোপযোগী) চিক্কণ মৃত্তিকাপবিপূর্ণ। কিন্তু সাধারণতঃ উহা এরূপ খণ্ড খণ্ড উদ্ভিজ্জাবশেষপূর্ণ যে, তাহাব (উদ্ভিদেব) জাতি বিভাগ অসম্ভব। এই নিম্নস্থ ভূমিখণ্ডেব নিম্নতর দেশ সমধিক পবিষ্কাব মৃত্তিকাবিমিশ্রিত এবং উহাব তলদেশে আঁটাল মাটী পাওয়া যায। ভূপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ২০ ফুট নিম্ন হওযায ঐ স্তবেব বেধ ১৭ ফুট।

তন্নিম্ন স্তবে অবিশুদ্ধ উদ্ভিদজাত অপবিণত খনিজ কযলা (impure peat)। উহা শুষ্ক হইলে এক প্রকাব অদাহ্য হয। ইহাতে সুন্দবী বৃক্ষেব গুঁডি পাওযা যায়, ঐ সকলেব শিকড় তন্নিম্ন ভূমিতেপ্রবিষ্ট। এই স্তব পুষ্করিণীব সমুদয অংশে ব্যাপ্ত এবং অনুমান হয, সর্ব্ব স্থানে সমান গভীব না হইলেও কলিকাতা এবং ভাগীবথী পাবস্থ হাবড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ রূপ স্তব নিম্ন জোযাব সমতলে গার্ডন বিচ এবং বোটেনিকেল উদ্যানেব নদীতীবেও দেখা যায। এই সকল স্থানে উহাব চবম গভীবতা শেযালদহে দৃষ্ট গভীবতা হইতে ৬ ফুট অধিক। অপবদিকে ফোর্টউইলিযমে তিন বাব তিনটী স্থান খননে উহা ৫১ ফুট নীচে পর্য্যন্ত দেখা গিযাছিল, এবং ফোর্ট ও শেযালদহেব প্রকৃত ভূপৃষ্ঠ সমতলতা হইতে ৩ ফুট অন্তব ধবিযা শেযালদহ অপেক্ষা ফোর্ট ২৮ ফুট এবং বোটানিকেল উদ্যান অপেক্ষা ৩৭ ফুট নিম্ন হইযা পডে। উপবি উক্ত দুইটী খনিত ক্ষেত্রেব সমতলতাব বিশেষ প্রভেদ থাকা সত্বেও এই রূপ ভূভাগ দর্শনে ইহা উপলব্ধি হয যে ঐ স্তব হয ত একাদিক্রম অথবা উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম ব্যাপ্ত।

উক্ত উদ্ভিদজাত অপবিণত খনিজ কযলা স্তর (peat bed) জমাট কর্দ্দম-রাশিব উপব স্থাপিত, উহাব উপবিভাগ সিকতাময এবং নিম্ন দিকে নীল বর্ণ কঠিন মৃত্তিকা। এই স্তরে ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ ৩০ ফুট অথবা উদ্ভিদ-জাত অপবিণত খনিজকয়লা স্তব হইতে ১০ ফুট নিম্নে বিভিন্ন সমতলে সুন্দরীর গোড়া সকল পাওয়া যায়। ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের পরিদর্শন কালে এই

বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে যে স্থানে সুন্দরী বৃক্ষ জন্মায় (সুন্দরবন) সেখানকার ভূপৃষ্ঠ ভাগীরথীর নিম্ন ভাটা সমতল হইতে ১৮।২০ ফুট নীচে না হইলে শেয়ালদহের যে খানে গোড়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেখানে ঐ বৃক্ষ জন্মান অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক সুন্দর বন সেরূপ সমতলে অবস্থিত নহে। তবে শেয়ালদহের ঐ সকল বৃক্ষের উৎপত্তির পরে ঐ স্থানের ভূপৃষ্ঠের অনেক ফুট অধোগমন হইয়াছিল। ভাগীরথী এবং বহিঃ-সুন্দরবনের নিম্ন সমতল সম্বন্ধে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব কোন বিশেষ প্রমাণ পান নাই বটে, কিন্তু তিনি ডাক্তার লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, ভাগীরথী ও ক্যানিং টাউনের অন্তর্গত মাতলার সমতল দ্বয়ের অন্তর অতি সামান্য এবং উহা প্রকৃত (Geological range of sundri) হইতে অধিক মাইল উপরে হইবে না। অন্য পক্ষে খালটী এত প্রশস্ত ও গভীর যে উহাতে ভাগীরথীর নিম্ন জলোচ্ছ্বাসের সমতলতার কিছু মাত্র অনুমান করিতে দেয় না। সুন্দরী বৃক্ষশ্রেণী যেস্থানে অবস্থিত এবং উহা যে ৬।৮ ফুট অত্যল্প জোয়ার সমতল মধ্যে জন্মায় না, এই সকল কারণে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিয়ালদহের খনিত পুষ্করিণীর যে সমতলে গোড়া পাওয়া গিয়াছিল, ঐ সমতলে ঐ বৃক্ষ জন্মিবার পরে যে ঐ ভূমির ১৮ কিম্বা ২০ ফুট অধোগমন হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বলেন যে ফোর্ট উইলিয়মে খনন কালীন উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের উপরে এবং নিম্নে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় উহা যদ্যপি ঠিক ভাবে স্থাপিত হয় (তাহা তিনি সম্ভবত বিবেচনা করেন) তাহা হইলে সেখানেও যে ভূপৃষ্ঠের অধোগমন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই ৪৬ হইতে ৪৮ ফুটের ন্যূন হইবে না। কিন্তু এই দুই স্থানের ভূপৃষ্ঠ সমসাময়িক কি না এবং তদনুসারে সমদূর পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক বসিয়া যাওয়া সত্য কি না তদ্বিষয়ে বিশ্বাসের বিশেষ প্রমাণাভাব।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের মতে এই অধোগমনের পরিমাণ ন্যূনাধিক হইলেও উহা বহুদূরব্যাপী। তিনি লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট অবগত হয়েন যে, মাতলার নিকট ক্যানিং টাউনে উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর ২০

বৃক্ষাবশেষের দুইটী নমুনা নিম্নদেশ হইতে বাহির হইয়াছিল। উহাদিগের মূল নিম্নস্থ কর্দ্দম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এই স্থান হইতে ৪ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত একটী কূপ খনন করা হয়, ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহাতে উক্ত জাতীয় বৃক্ষের শিকড় ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত ছিল। অতএব এই সকল বৃক্ষ পূর্ব্বোক্ত খালের নিম্নতর জল-সমতল হইতে ঠিক ১৫½ ফুট এবং ভাগীরথীর নিম্নতর জল-সমতল হইতে ঠিক ১৩ ফুট নিম্নে জন্মিয়াছিল।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের পরিদর্শন কালে আর অধিক খনন করা হয় নাই। কিন্তু তিনি লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ঐ পুষ্করিণীর তলে একটী সুগভীর কূপ খনন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ণ করা হইয়াছিল, তাহাতে পুষ্করিণীর নীচে ১৫ ফুট ঐ কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ স্তর আবার একটী জীর্ণ উদ্ভিজ্জাবশেষবিমিশ্রিত শিথিল কৃষ্ণবর্ণ সৈকত স্তরের উপর স্থাপিত। তদনুসারে উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের (peat bed) নিম্নে ঐ স্তরের বেধ ২৫ ফুট হইবে। উইলিয়ম দুর্গের খাত স্থানের সঙ্গে ঐ উদ্ভিজ্জাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের অনেকাংশে ঐক্য দৃষ্ট হয়। সেখানে (ফোর্টে) ঐ উদ্ভিজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর কঙ্কর ও কাষ্ঠ-বিমিশ্রিত নীল বর্ণ কর্দ্দম এবং তন্নিম্নে ন্যনাধিক ২১ হইতে ২৫ ফুট বেধযুক্ত পীত বর্ণ কর্দ্দম স্তরের উপর স্থাপিত, এবং এই স্তর ঈষদ্রক্তবর্ণ আর্দ্র সৈকত স্তরাশ্রিত।

শেয়ালদহের খাত স্থানের ৩০ ফুট নিম্নে গাছের গোড়া পাওয়া যায় এবং উহার দ্বারা 'ব'দ্বীপটী বসিয়া যাওয়া প্রমাণীভূত হইতেছে—এই দুইটি কথা প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য। যে সকল বৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইল, উহার নমুনা ব্ল্যানফোর্ড সাহেব ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন সাহেবের নিকট অর্পণ করিয়া-ছিলেন, তিনি উহাকে সুন্দরী বৃক্ষ বলেন। সমতলতা সম্বন্ধে এই জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী উচ্চজোয়ার সমতলের ২ হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত নিম্নে হইয়া থাকে। উহা কেবল কর্দ্দমের উপর অথবা যেখানকার ভূপৃষ্ঠ সর্ব্বদা জল-মগ্ন হইয়া ঘাস বর্দ্ধিত হয়, অথচ প্রত্যেক জোয়ারের পরে বৃক্ষ সকলের গোড়া অনেকক্ষণ বাতাস পায় সেই সকল স্থানেই জন্মিয়া থাকে। ইহাতে

ফুট নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানের প্রকৃত ভূপৃষ্ঠসমতল শেয়ালদহ হইতে যে অনেক ফুট নিম্নে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি কর্ণেল গ্যাষ্ট্রেল (Col: Gastrell) সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন যে যশোহরান্তর্গত খুলনা নামক স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন কালে, দেখিতে পাওয়া যায় উদ্ভিদসম্ভূত স্তর ১৬ ফুট হইতে ২০ ফুটের মধ্যে স্থাপিত এবং শিকড়যুক্ত বৃক্ষের গোড়া সকল ১৮ হইতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভিন্ন সমতলে প্রোথিত।

উপরি উক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপটী গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত অধোগামী হইয়াছে। কেন না নিম্নে যে সকল স্থানে সুন্দরী বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল যে এক কালে ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বলেন ইহাতে স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল স্থানের খনন বিষয় তিনি অবগত আছেন, সে সকল স্থানের বৃক্ষ সমূহ ৮ হইতে ১০ ফুট উর্দ্ধ স্থূলতার মধ্যেই (Vertical thickness) দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; এবং উপরিস্থ স্তরসমূহ সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জাবশেষ এবং নদীজলসম্ভূত শম্বুকাদিতে পরিপূর্ণ থাকা সত্বেও ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বকার ভূপৃষ্ঠের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে যে কেবল অধোগমনের এক ভাবিতা প্রকাশ পাইতেছে এমত নহে, অধোগমন এত শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল যে, নদীস্রোততাড়িত মৃত্তিকা (পলি) দ্বারাও তত শীঘ্র ভরাট হওয়া অসম্ভব।— [ক্রমশঃ।]

---

* Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal vol XXXII No. I to IV and a Supplement No.—1863.

Note on a Tank Section at Sealdah Calcutta by H. F. Blanford A. R. S. M., F. G. S.

ভালবাসা।

১

এত দিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে !
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে !
যেখানে অনন্ত স্তব্ধ,
খুঁজিতেছি সেথা শব্দ !
যেখানে অনন্ত স্বপ্ন, খুজিতেছি সেথা কাজ !
নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি,
খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি !
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা, অনন্ত খেলার মাঝ !
—এত দিনে বুঝিলাম, কি হবে বুঝিয়া আজ ?

২

থামিযা গিয়াছে গান,
শুইয়া প'ড়েছে প্রাণ,
টানিতে পারি না বায়ু আর আমি শ্বাস পূরে।
থেমেছে কল্পনা, ভাষা,
সুখ, দুখ, সাধ, আশা।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে !

৩

কোথা তুমি ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে !
গান ত হইল শেষ,
কোথা তুমি সুর-রেস ?
সুখ দুখ হ'লো শেষ, হ'লো শেষ কারে ঘুরে ?

উলটি পালটি পাতা,
ক্রমে শেষ হ'লো খাতা;
মুদে এলো আঁখি-পাতা, বুক গেল ভেঙেচুরে।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!

৪

মিছে এ কল্পনা মোর, লাগিল না কোন কাজে।
মিছে এ জোয়ার ভাঁটা;
মিছে ফোটা, খোলা কাঁটা;
মিছে বাঁধা বাঁধা-বীণা; মিছে রঙ্ ছবি-ভাঁজে।
মিছে এ জোনাকী রেখা,
শারদ জ্যো'স্নায় লেখা;
মিছে লঘু মেঘ-ছায়া মধ্যাহ্ন তপন-ঝাঁজে।
মিছে এ তরুর কম্পে
ঝটিকার ভীম ঝম্পে;
মিছে এ ঊর্ম্মির ঘূর্ণী তরঙ্গের রঙ্গ মাঝে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ঘুম ভাঙে না।

সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ একদিন গাইয়াছিলেন—

"সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না।"

কি ঘুমের ঘোরে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথা হইতে যে এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছ, তাহার কিছু ঠিকানা নাই। এ ঘুমের ঘোরে যত ঘুরিতেছ ততই যেন ঘোর আরও চাপিয়া ধরিতেছে—মাথা তুলিতে দেয় না। এই সাধের ঘুম ঘুমাইতে ঘুমাইতে সাধের ঘোরে বিভোর হইয়া কি করিতেছ, কত কি স্বপ্ন

দেখিতেছ, কত দিন হইল কত কি দেখিয়াছিলে সে গুলির ঘোর না ছাড়িতে ছাড়িতে আবার কি নূতন ঘোর আসিল, আবার কি নূতন স্বপন দেখিলে, তাহাতে কে যে কি এক রকম বিহ্বলতা মাখাইয়া দিয়াছে, কি বিভোর-তন্দ্রাময় ভাব মিশাইয়া দিয়াছে, যে তাহার বশে পড়িয়া আর ঘুম ছাড়িতে পারিলে না। যত ঘুমাও তত ঘোর বাড়ে, যত ঘোর বাড়ে তত স্বপ্নে কত কি কর—কত কি দেখ, দেখিতে দেখিতে—তাহার সঙ্গে মিশিতে মিশিতে—ঐ আরও যেন জড়তা বাড়িল—সে স্বপন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় কি গেল—ঘুম ত ভাঙ্গিল না। তুমি কোথায় শুইয়াছিলে? মনে ত হয় না,—যেখানে ছিলে সেই খানেই আছ কি? এখন কোথায় আছ? তোমার বিছানা কৈ?

"ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা"

সেই অনন্তকালের অনন্ত শয্যায় সাধে শয়ন করিয়াছিলে। সেই কাল বিছানায় শায়িত হইয়া কালের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, সেই সাধের ঘুমের ঘোর কেবল বাড়িতেছে—অনন্ত জগতের অনন্ত ঘোরে পড়িয়াছ—এ ঘোর ও ছাড়িবে না, তোমার ঘুমও ভাঙ্গিবেনা।

অনন্তকালের—অনন্ত জগতের মধ্যে তুমি এতটুকু—কাল শয্যায় শুইয়া আছ, কত স্বপ্ন দেখিতেছ—পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কত কি—সবই কি স্বপন? এগুলি কোথা হইতে আসিল? স্বপনে কি পাতাইয়া লইয়াছ? যাদের সহিত পাতাইয়াছ—যাদের সহিত এই সাধের ঘুমের, ঘোর স্বপনের বাঁধন বাঁধিয়াছ তারাও কি তোমার মত এই কাল বিছানায় সাধের ঘুমে কাতর!—সবাই কি তোমার মত কালের ঘুমঘোরে—সাধের স্বপনে সব কাজ করিতেছে? এ স্বপন দেখিতে দেখিতে—এ জড়তায় সবাইকে জড়াইতে জড়াইতে—ঐ যে মাতার কাজ শেষ হইয়াছে!! তাঁর স্বপনের বাঁধন যে কাটিল! তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে না কি? তিনি কাটিলেন—তুমিত পারিলে না, বন্ধনরজ্জুর আর একদিকে তুমি তেমনই বাঁধা আছ। আবার ঐ! যাহাকে ভাই বলিতে, সেও ত এই অল্পদিনের জোর বাঁধনটি কাটিয়া গেল! তুমি বাঁধা পড়িয়া আছ। বাঁধনটি কম দিন হইল দিয়াছিলে কিন্তু বড় জোরে দিয়াছিলে—তথাপি কাটিয়া গেল! আহা!

এ বাঁধনের আবার সবই বিপরীত। পুরাণ বাঁধনগুলির জোর না কমিয়া আরও বাড়িতেছে। কাল-চক্রের কঠোর নেমীর পেষণে তুমি চূর্ণ হইয়া যাইতেছ, বল সবই যে গেল—বড় হীনবল হইয়া পড়িতেছ—তাই ঘুম আরও চাপিয়া ধরিতেছে। এ ঘুমের ঘোর—এ স্বপনের জোর কমে না কেন? তোমার এত ঘুম কেন?—

"এই যে সুখের নিশি জেনেছ কি ভোর হবেনা"

তোমার এত ঘুম কেন? এই অনন্ত কালের মধ্যে তুমি এতটুকু মাত্র কাল অধিকার করিয়াছ বৈ ত নয়—তাহা ত একদিন শেষ হইবে। অনন্তকাল-সাগরে তুমি একটী ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদ্—তোমাকে একদিন এই সাগরে মিশাইযা লইবে। নিমেষের জন্য উঠিয়াছ—নিমেষের জন্য এত আড়ম্বর কেন? ভানুর সুবর্ণময় কিরণে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া এত বাহার দিতেছ কেন? তুমি কিসের বশে এত বিহ্বল? কালশযনে শায়িত হইয়া কি আকর্ষণে তোমাকে টানিয়া রাখিয়াছে যে তুমি এ ছাই ঘুমের ঘোর ছাড়িতে পারিতেছ না?—কাহার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছ?—

"তোমার কোলেতে কামনা কান্তা তারে ছেড়ে পাশ ফের না"

তোমার কাল বিছানায় সাধের ঘুমে আবার সঙ্গিনী মিলিয়াছে—একে ত নিজে পূর্ণমাত্রায় বিহ্বল—তাহাতে আবার প্রিয়তমা কামনার সহায়তা পাইয়াছ; তাহার প্রলোভনে—তাহার প্ররোচনায়, তোমার যে টুকু জড়তার অবশিষ্ট ছিল তাহাও পুরিয়া উঠিযাছে। কামিনীর সহিত এক শয্যায় শায়িত হইয়া—তাহার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া—তাহার ভুবন ভুলান রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া—তাহার মনোহর অধরপ্রান্তে মুগ্ধকরী হাস্যছটা দেখিয়া তোমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ক্ষমতা পর্য্যন্ত গিয়াছে কি?

তুমি যখন প্রথম এ কালশয্যায় শয়ন করিয়াছিলে তখনকার কথা মনে হয় কি? তখন ত তোমার সহচরী ছিল না। দিন দিন তোমার যত ঘুমের ঘোর বাড়িতে লাগিল—স্বপনে যত নূতন দেখিতে লাগিলে ততই তোমার স্পৃহা বাড়িতে লাগিল—'আরও ঘুমাই আরও স্বপন দেখি'। কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ, কি করিতেছ, এ কাল নিশি পোহাইলে কোথায় যাইতে হইবে তাহা কিছু ভাবিলে না, দেখিতে দেখিতে নূতন নূতন স্বপনে মাতিলে, অবিরত

নূতনে ভুলিযা দেখিতে দেখিতে এক দিন "কামনা" তোমাব চক্ষে পড়িল—বড় মোহিনী মুর্ত্তি—যাহার চক্ষে একবাব পড়ে সে মোহিনীর সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকর রূপমোহে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না—তুমিও সেই মোহে পতিত হইলে। কামনাকে কালশয়নে সহচরী করিয়া লইলে, এখন মোহের বাঁধন কাটা দূরে থাকুক "কামনাব" সংস্রব—"কামনাব" স্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগের ক্ষমতা তোমাব নাই। "কামনা" সদাই এখন তোমার সহচারিণী, এই "কামনার" স্পর্শ সুখানুভবের স্পৃহা, দর্শনানন্দ অনুভবের লালসা একবার পরিবর্জ্জন কর—তাহার কোমল বাহুলতার দুশ্ছেদ্য বন্ধন একবার ছেদন কর—অত মোহিত হইও না, অঙ্কশায়িনী প্রিযতমা কান্তা "কামনার" প্রতি বিমুখ হইয়া একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন কর দেখি!

"আশার চাদর দিয়েছ গায, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না"

সংসার চক্রের ঘূর্ণনে যথেষ্ট ঘূর্ণিত হইয়াছ—সুখস্বপনের আবেশভরে কামনার বিশ্ববিমোহিনী রূপ মধুরিমায তুমি যার পর নাই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছ; এ বিহ্বলতা অপনোদনের চেষ্টা কবা দূরে থাকুক, তুমি আবার তৎসঙ্গে আর এক কুহকিনীর মুগ্ধকবী ছলনা বলে আপাদমস্তক কুহক-বিজড়িত হইযা অধিকতর মত্ত হইয়াছ। যাদুকরী আশার আবরণ-বসনে আবৃত হইযা সংসারের যথার্থ অবস্থা—তোমার আপন প্রকৃত ভাব দেখিতে তুমি এক্ষণে অক্ষম। এই কুহকে পড়িয়া তোমার এত আড়ম্বর—অনন্ত কাল মধ্যে এতটুকু মাত্র সময় পাইয়া,এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর সামান্য স্থান দখল করিয়াও তোমার এত অস্ফালন,এত বাহার, এত জোর; এই আশাকুহকিনীর যাদু বিদ্যার এমনই বল—কুহকের এমনই মায়া মাখান ভাব—এমনই ছলন-কৌশল—যে তোমাকে তিলেকের জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিতে দিতেছে না, তুমি যে বাহ্য জগতের ভাবগতি দেখিয়া তোমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবে তোমায় সে অবকাশ টুকুও দিবে না—তোমার সে ক্ষমতা টুকু অপহরণ করিয়াছে।

মায়াবিনীর ঘোর মায়াবশে বশীভূত হইয়া তুমি আপনার লইয়াই ব্যস্ত। কত আকাশকুসুম তোমার নয়নসমক্ষে সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট

হইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তার অপার সৃজনলীলা মধ্যে অপরিগণনীয় সামান্য জীবরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াও তুমি কত অসাধ্য সাধনের উদ্যোগ করিতেছ। তুমি তোমার এই সমগ্র নশ্বর জীবনে যত টুকু কাল অধিকার করিতে পারিয়াছ তাহার লক্ষগুণ অধিক কাল সংসার সাগরে বুদ্‌বুদ্ স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিলেও যে কার্য্য তোমার পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য, আজ আশা কুহকিনীর প্রবল কুহকবলে—মায়াবিনীর অদ্ভুত ছলনার কৌশলে তাহা তোমার নিকট নিতান্তই নিমেষসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই মায়িক আবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত রাখিতে তোমার যেন সাধ বাড়িতেছে—মুখের এ অবগুণ্ঠন, নয়নের এ কুহকমাখান আচ্ছাদন উন্মোচন করিতে তোমায় কোন মতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছেনা—এ মায়াবরণের মধ্য হইতে সকলই অতি সুন্দর, নিতান্ত মনোহর বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ—তাই তোমাব মুখ খুলিতে ইচ্ছা করে না।

"আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে" * * *

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পব বৎসর আসিতেছে, যুগের পর যুগান্ত সংঘটিত হইতেছে তথাপি তোমার এ ছাই কুহকের ঘোর বিন্দুমাত্র অপনোদিত হইতেছে না—চিরদিনই সমান ভাবে প্রতি নিয়ত সেই মায়ার বশে মোহিত হইয়া রহিয়াছ। সুখের শীতে সে "আশা"-আবরণে আবৃত হইয়া উত্তাপানুভবে পরম সন্তোষ সম্ভোগ করিয়াছিলে, কিন্তু দুঃখের এ ঘোর গ্রীষ্মেও মিছা কুহকের আচ্ছাদন রাখিয়া আর কেন বাহ্যিক গ্রীষ্ম পরিবর্দ্ধিত করিতেছ? কেন ও সন্তপ্ত হৃদয় অধিকতর উত্তপ্ত করিতেছ? একবার মোহকরী ছলনার এ আচ্ছাদনবসন উন্মোচন কর "আশার" গাত্রাবরণ হইতে একবার মোহের মলা ধৌত কর দেখি!! তোমার সে ক্ষমতা আছে কি? আর কিরূপে থাকিবে, যাহা ছিল তাহা ত একে তুমি মায়াবিনীদিগের প্রবল কুহকে সকলই হারাইয়াছ—তাহার উপর আবাব একি!!

"খেয়েছ বিষয় মদ সে মদের কি ঘোর ঘোচে না
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে" * * *

তোমার মোহের কি কিছু বাকী ছিল? তোমার বিহ্বলতা কি পূর্ণ মাত্রায়

পরিপূরিত হয় নাই? তোমার জড়তার কতটুকু অবশিষ্ট ছিল। মত্ততার মাত্রা ত কালে কালে পুরিয়াছে, তাহার উপর আরও মাতিবার ইচ্ছা!

ভবের গাছে নিয়ত পাক খাইতে খাইতে তোমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতেছে, হস্তপদাদি অবশ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে "কামনার" রূপের মোহ মিলিত হইয়া তোমাকে কতদূর মোহিত ও সংসারে জড়ীভূত করিয়াছে। তৎসঙ্গে আবার আশাকুহকিনীর ছলনাবলে তোমার মোহের ত কিছুই বাকী নাই, তুমি পূর্ণ মাত্রায় মুগ্ধ, তোমার আত্মভাবপর্য্যবেক্ষণ ও বাহ্য জগতের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শনের ক্ষমতা ত গিয়াছে—তাহার উপর আরও মাতিবার ইচ্ছা! যদি মাতিবার এত বাসনা হইয়াছিল, যদি উন্মত্ততাই তোমার পক্ষে এত সুখকর—এত আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তবে এ সংসারে—এ ভবের বাজারে আর কি অন্য মাদক ছিল না? এ তীব্র গরল সম "বিষয়" মদ্য পান করিলে কেন? ইহার মাদকতা কি এ জীবনে কখন দূরীভূত হইবে?

"আশার" মোহে তুমি বাহ্যজ্ঞানরহিত—যে কিছু আন্তরিক বিবেচনা শক্তি ছিল, তাহাও এই নেশার ঘোরে নষ্ট করিলে—তুমি যে হিতাহিতজ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াছ। "বিষয়" মদের নেশার জোরে ভাবিতেছ তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান—তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান—তুমিই শ্রেষ্ঠ বিবেচক—আজ যেন এ বিশ্ব সংসার তোমারই করতলস্থ—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আজ তোমার চক্ষে ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডবৎ পরিদৃশ্যমান! তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কাহারও প্রতি দৃক্পাত নাই—আজ তুমি স্নেহশীল সহোদরের সহিত ঘোর কলহে প্রবৃত্ত—তুমি আজ বিষম স্বার্থপর! তোমার আজ জন্মদাতা অন্নদাতা প্রতি-পালক পিতাকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য নাই—তুমি আজ চরম অকৃতজ্ঞ—পরম দুরাচার! কেন এ বিষম বিষয়-মদ্য পান করিলে? এ নেশা যে কখন ছুটিবে না—দিন দিন বাড়িতেছে—আরও বাড়িবে। তুমি দিবারাত্রি সমান উন্মত্ত—অভি-ভাবকের প্রতি সম্মান নাই—ভ্রাতা ভগিনীর নিকট কুণ্ঠা নাই—আত্মীয় স্বজনের নিকট লজ্জা নাই—প্রতিবাসীজনের নিকট অপবাদভয় নাই—নেশা দিবারাত্রি সমান—বার মাস সমান ভাবে চলিয়াছে। তাহার উপর আবার মাত্রা বাড়াইতে পারিলে ছাড়না। মিনতি করি! আর মাত্রা বাড়াইয়া কাজ নাই, আর কেন? এততেও কি আশা মিটিলনা—কাল যে ফুরায়—

"অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই ঘুমাযে আশা পূরে না,
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে ডাকলে আর চেতন পাবে না।"

ভাই, এত ঘুমাইলে, এত কুহকে জড়াইলে, এত নেশা করিলে, এত ঘুমের ঘোর বাড়াইলে, তথাপি কি ছাই এ আশা পূরিলনা? যদি আশা না পুরিয়া থাকে, তবে ভব-সাগরে এ বর্ত্তমান জলবুদ্বুদলীলায় তোমার আর আশা পুরিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার জন্য একটি দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, সে দিন যে কোন্ দিন আসিবে, তাহা তুমি ত ঠিক জান না, তবে একবার ভাবিয়া দেখ না কেন সে দিন সদাই নিকটবর্ত্তী। আজ তুমি ঘুমের ঘোরে বিভোর, নেশার জোরে অচেতন, কিন্তু তোমাকে ডাকিয়া সাড়া পাইয়া কত কথা বলিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিতেছি, সে দিন ত তোমার আর সাড়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে না, সে যে মহাঘুম—সে ঘুম ত কোন মতে ভাঙ্গাইতে পারিব না, সেই ঘুমে তোমার সব সাধের ঘুম—সকল মনোহর স্বপন, মিশাইয়া যাইবে। এ সুখ-স্বপনে যাদের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলে সে পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন সবাই তোমা হইতে সে দিন বিচ্ছিন্ন হইবে। সেই দিন অঙ্কশায়িনী প্রাণাধিকা কান্তা কামনার বাহুবেষ্টন তোমার কণ্ঠ হইতে সজোরে মোচন করিয়া লইবে। আশার এত মোহের আবরণ, এত যে ভুবন-ভুলান ছলনার আচ্ছাদন—সেই দিন তোমার অঙ্গ হইতে উন্মোচিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। এ বিষয়মদের পানপাত্র যেমন তেমনি পড়িয়া থাকিবে। এ সাধের স্বপনের শেষ সেই খানে—তার পর সে মহাঘুমে আর কি স্বপন দেখিবে বলিতে পারি না—তাই বলিতেছি যে তোমায় লইয়া এত খেলা খেলাইতেছে, কত সামগ্রী আনিয়া কত বিধানে কত রকম রকম খেলা দেখাইতেছে, খেলিতে খেলিতে একবার সেই খেলানাওয়ালার সন্ধান কর দেখি, তাহাকে ডাক দেখি। সেই সব জানে, সেই সব করিতেছে, তাই বলিতেছি একবার সেই সবজান্তাকে ডাক-না ভাই!!

শ্রীষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশক্তি।

এক্ষণে এই শক্তির মূল সংস্কার কি প্রকারে শিক্ষা করিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব। প্রথমতঃ মনঃসংযোগ শিক্ষা করিতে হইলে দৃঢ় শক্তির (energy) আবশ্যক। এই মনঃসংযোগে মানসিক দৃঢ়তা জন্মায়, দূরদৃষ্টি জন্মায়, স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়। এই মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা আমরা নানাবিধ আবশ্যকীয় কাজ করিতে সমর্থ হই। এটী সপ্রমাণ করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমরা দেখিতে পাই কত মহাত্মা পুরুষ এই অপূর্ব্ব মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা কত অসামান্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। আজ Sir Wm Thomson প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই মনঃসংযোগ দ্বারা পার্থিব বিষয়ে কত উন্নতি করিযাছেন, আজ তাঁহারই মনঃসংযোগের বলে তারযন্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে। Stephenson ও watt এর মনঃসংযোগ দ্বারা বাষ্পীয় যানের কত সুবিধা হইযাছে। এগুলি অলৌকিক না হইলেও অসামান্য বলিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা কি একবার কেহ ভাবিযাছেন যে এ গুলি কেবল এই শক্তির বাহ্যিক প্রযোগ মাত্র? এ কথা কি কেহ একবার মনে করিযাছেন যে এ শক্তির আন্তরিক প্রযোগে আরও কত অসামান্য কাজ করা যাইতে পারে? শরীরের কার্য্যপ্রণালীর সহিত মনের কার্য্যপ্রণালীর তুলনা যেরূপ অসাধারণ, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাবলীর সহিত শেষোক্ত গুলির সম্বন্ধও তদ্রূপ। তবে কেন বিশ্বাস করিব না যে কোন গূঢ় প্রণালী দ্বারা আমাদের ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই শক্তি মনের উপর প্রযোগ করিয়া কত অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত করিয়া গিযাছেন?

তবেই সেই শক্তিটী প্রথমতঃ মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎকে ও দ্বিতীয়তঃ শরীর বা বাহ্যজগৎ ও মানুষের যাবতীয় কার্য্যাকার্য্যকে শাসন করিতেছে। সুতরাং যখন এই মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎ ও ক্রিয়া বা বাহ্যজগৎ এ উভয়ের একত্র সমাবেশই অদৃষ্ট, তখন অদৃষ্টটাও কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যাধীন বলিতে হইবে। অদৃষ্ট বলিলেই কিছু আর "ঢেউ দেখে না ডুবান" গোছের কোন অমানুষিক কথা বুঝায় না—ইহাতেও মানুষের বেশ হাত আছে। ইহাকেও ইচ্ছা

করিলে এড়াইতে পারা যায়। তবে যাহার কারণ আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য তাহাই 'অদৃষ্ট'।

একটী কুকুরকে বহু দিবস বাঁধিয়া রাখিয়া পরে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার এক প্রকার আশ্চর্য্য বিক্রম অনুভব করিতে পারা যায়। কুকুরটি যতদিন তাহার স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই তত দিন তাহার শক্তি তাহার শরীরে নিহিত ছিল। এক্ষণে স্বাধীনাবস্থায় সেই শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ মানুষ যদ্যপি বৃথা আমোদে, বৃথা উল্লাসে, সময় ক্ষেপণ না করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করে তাহা হইলে পরিশেষে কোন প্রকৃত মহান্ বিষয়ে তাহার চিন্তাশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে সমস্ত রিপুগণকে ঐ শক্তি দ্বারা বশে রাখিয়া যদি শুদ্ধ মনঃসংযোগ অভ্যাস করা যায় তাহা হইলে একটি প্রকৃত বীরের ও জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করা হয়। তাই কি বলে The greatest conqueror is he who conquers himself? এই মনঃসংযোগ শিক্ষাকালে অন্যান্য সুফলদায়িনী শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়, রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিতে হয়, উৎকট বাসনাগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে ঐ শক্তির রূপান্তর দৃঢ় সংকল্পরূপে পরিণত হইয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব তেজের বা শক্তির বিকাশ করে। এই শক্তির বল, রিপুগণকে বশে রাখিবার বলের অনুরূপ (equivalent) বা সমান। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এই রূপ ইন্দ্রিয়াদি দমন শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের সঙ্কল্পবল এত অসামান্য ছিল—আজকাল ইন্দ্রিয় দোষটাই সেই ব্রহ্মতেজঃ হ্রাসের এক মাত্র কারণ।

সাংসারিক নানাবিধ জঞ্জালে মনঃসংযোগ ব্যাপার বড় দুরূহ, আমাদের এক্ষণে সামান্য অবমাননা সহ্য হয় না, গাত্রের জ্বালা সহজে নিবারণ হইতে চায় না, সর্ব্বদাই মন উৎকট বাসনায় মগ্ন। প্রথম মুহূর্ত্তে অন্নচিন্তা, দ্বিতীয়ে কন্যাভাব, তৃতীয়ে রোগ, চতুর্থে বৃথা আশা ইত্যাদি নানা কারণে মন কদাচ সুস্থির নয়। বিষয়ান্বেষণে কেবলই রত, অহঙ্কারে কেবলই মত্ত, অতএব মনের স্থিরতা বা দৃঢ়তা কোথায়? ইন্দ্রিয়গণের লালায়িততা সহজে পরিতৃপ্ত হয় না, উপভোগের দ্বারা কামবৃত্তি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, কারণ সুখের উপর মন আবার সুখ চায়। এই রূপ নানা কারণে চিত্তের স্থৈর্য্য বিকলিত হয়,

ধারণাশক্তির হ্রাস হয়, সঙ্কল্পশক্তি জন্মাইতে পায় না। আজ কাল এই সকল গুলির শক্তি একত্রে ও একসূত্রে মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—ইহা হইতে আর পুনরুত্থান অসম্ভব। যেরূপ বাহ্যিক ইচ্ছাপ্রকাশে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ কপট ভক্তিতেও কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব—সেই জন্য মনের নির্ম্মলতা অগ্রে আবশ্যক।

আজ কাল থিওসফিষ্ট বলিয়া যে একটা সম্প্রদায় দেখা যায়, তাহাদের ধর্ম্মের মূলে এই মহতী শক্তি নিহিত আছে; তাহাদের সমস্ত কার্য্য দৃঢ়সঙ্কল্পদ্বারা সাধিত হয়। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে আর্য্যঋষিগণের ন্যায় শুচি ও পবিত্রভাবের এত আদর। তাহারা প্রথমতঃ মানসিক বিকৃতি হইতে শুদ্ধাচার দ্বারা পবিত্রতা ও স্থৈর্য্যলাভ করে, পরে ক্রমশঃ মনঃসংযোগ অভ্যাস করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প লাভ করিয়া থাকে। এই সঙ্কল্প দ্বারা তাহারা গত আত্মার সাহায্যে নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা থিওসফিষ্টগণকে একেবারে ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। তাহাদের মূলসূত্র যখন দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তখন তাহাদের কার্য্যকলাপ একবারে উপহাস্য কখনই হইতে পারে না—তবে যাঁহারা চক্ষুরতীত কিছুই বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। আমরা কোন কোন আশ্চর্য্য বিষয় বিশ্বাস করি না। সাধারণতঃ যাহা অনুভব করিতে পারি তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। জগতে একেবারে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। আমরা শূন্যমার্গে হস্তী বিচরণ, মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় অনুভব করিতে পারি, কিন্ত বিশ্বাস করিতে পারি না। দুইটী সমান রেখা দ্বারা একখণ্ড জমী বেষ্টন অনুভব করিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও পারি না। সেক্ষপীরের গল্পে যে একজাতীয় লোক আছে, তাহাদের মস্তক স্কন্ধের নিম্নদিকে, এটী অনুভব করিতে পারিলেও বিশ্বাস করিতে পারি না—আবার একটী ক্ষুদ্র কীটের দংশনে একটী বৃহৎ হস্তী হত হইয়াছে এটী অনুভব করিতেও পারি, বিশ্বাসও করিতে পারি। তাই আমরা বলিয়াছি 'সাধারণতঃ' আমরা যাহা বিশ্বাস করি, তাহা অনুভাব্য। আমরা এটি বিশ্বাস করি না ওটি বিশ্বাস করি না ইহার কারণ কিছুই নাই—কেবল মনের অবস্থান্তর মাত্র। সেই জন্য যিনি সর্ব্বকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন না, তাঁহাকে বুঝাইয়া বিশ্বাস

করান যায় না—বিশ্বাস কতকটা স্বাভাবিক। আমরা যেমন কতক অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করিতে পারি—কতক পারি না, কেন পারি না তাহার হেতু নাই, তদ্রূপ কেহ এটি বিশ্বাস করেন না, কেহ ওটি বিশ্বাস করেন না তাহাতে কিছু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে না। কিন্তু আমাদের মতে যতদূর পারা যায় সকলেরই বিশ্বাসটা দৃঢ় থাকা ভাল; ইহাতে অনেক বহুদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি জন্মায়। *বিশেষতঃ ভাল মন্দ বিচারে ইহা একটী প্রধান সহায়। তবে জোর করিয়া* কাহারও মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না।

(৮) ইংরাজী ভাষায় একটী কথা আছে " The dawn of a very brilliant life is involved in some obscurity".—এটি কি সত্য? বলিতে পারি না ইহা কিরূপে প্রমাণ করিব; কিন্তু ইহার অনুকূলে অনেকগুলি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বীরবর Achilles কে, জন্মগ্রহণ কালে, দুইপ্রকার জীবনের মধ্যে একটি মনোনীত করিতে বলা হইয়াছিল (১)A long but inglorious life—সাধারণ দীর্ঘজীবন (২) A short but gloriuos life. প্রতিষ্ঠাবন্ত ক্ষুদ্রজীবন। দেবতাদিগের এরূপ বাক্য আমাদিগের মনে হঠাৎ গিয়া বাজিল। আমরা বুঝিলাম, বুঝি বা একটি আর একটির বিপরীত। পরে দেখিলাম বাস্তবিকই তাই। দেখিলাম প্রতিভাশালী লোক বেশী দিন জীবিত থাকে না, ফুলটি কোরক অবস্থাতেই কীটদষ্ট হয়; ঈশ্বরও রমণীয় জিনিসটির লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। দেখিলাম যাঁহাদের জীবনের কৃতিত্ব অতি সত্বরেই লব্ধ হয় তাঁহাদের জীবন অতি অল্পস্থায়ী। আর যাঁহাদের প্রতিষ্ঠালাভ কিছুদিন পরে হয়, কিম্বা ধীরে ধীরে হয়, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলেও হইতে পারেন। তাহার কারণ—যে সীমাবদ্ধ শক্তিটি একটি জীবনকে গঠিত করিবে বলিয়া প্রেরিত হইয়াছিল তাহার কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করিয়া সেটি হ্রস্ব ও শিথিল হইয়া পড়ে সুতরাং তাহার জীবনের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। আর যাঁহার জীবনে ঐ শক্তিটি ধীরে ধীরে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করে তাঁহার জীবন কিছু বেশী হইতে দেখা যায়। এই জন্যই warren Hastings, wellington, প্রভৃতি যাঁহাদের জীবনের পূর্ব্বভাগ সামান্য ঘটনাপূর্ণ ছিল, তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী দেখা যায়; আর Shelley, Keats প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা একেবারে উল্কার ন্যায় জ্বলিয়া একেবারে

নির্ব্বাপিত হইল। যে লোক প্রকৃত প্রতিষ্ঠাশালী হইতে চান, তাঁহাকে নিরন্তর ধীরে ধীরে, নিরহঙ্কারে, বিনা মদে কার্য্য করিতে হইবে। লম্ফ দিয়া প্রতিষ্ঠা ধরিতে গেলে তাহা বেশীক্ষণ হাতে থাকে না—(He who grasps too much holds little)। যিনি অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠালাভ কামনা করেন তাঁহাকে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে চলিতে হয়, যিনি একেবারে কোন বিষয়ে জগতের নিকট বড় হইতে চান তিনি অহঙ্কার গর্ব্ব সবই করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের মন্তব্য বা বক্তব্য কিছুই নাই। তাই আমরা পরামর্শ দিতেছি হঠাৎ যেন কেহ 'বড়লোক' হইতে চেষ্টা বা আশা না করেন। ধৈর্য্য ও বিশ্বাস থাকিলে অবশ্যই পরে মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ইহাই আমাদের স্থির ও অবিচলিত বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য গুণ থাকিলে সোণায় সোহাগা হইয়া উঠিল। যাঁহারা আমাদের কথায় বিশ্বাস বা আস্থা দেখাইবেন না, তাঁহাদিগকে বলিবার আমাদের বেশী কিছুই নাই। তবে আমরা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দিলাম বলিয়া আমাদের মনে বিশ্বাস আছে যে অনেকেই এ যুক্তিগুলি সহজে অবহেলা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করেন, যাঁহারা Huxley, Tyndall, Spencer এর প্রিয় শিষ্য তাঁহারা অবশ্যই আমাদের বাক্যগুলি একেবারে Stuff and nonsense বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না—তবে অবজ্ঞা (indiffrence) একটা স্বতন্ত্র জিনিস, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ হয় না, সুতরাং জয়াশা বৃথা।

রিপুর বশীভূত হইলে লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে কেন? রিপুর অধীনতাবশতঃ যে বাহ্যিক অঙ্গবৈকল্য ও অঙ্গশৈথিল্য উপস্থিত হয় তাহাতে কতকটা চিৎশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায়। সময় কিম্বা অন্য কোন বাহ্যিক শক্তি ব্যতীত এই নষ্টশক্তির পূরণ হয় না। এই রিপুযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অন্যান্য কার্য্যে আর সমধিক শক্তি পাওয়া যায় না। যাহার যত বেশী রিপুপরতন্ত্রতা ও রিপুপ্রাবল্য তাহার কার্য্যক্ষতি তত বেশী। এই হেতুই অবিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করিলে অনেকে প্রায়ই শ্রমপণ্ডতানিবন্ধন অমনোযোগিতা অথবা অবিমৃশ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করিয়া থাকেন। আমাদের যাবতীয় কার্য্যেই, ধীরতা, স্থিরতা ও মনঃসংযোগ আবশ্যক, ইহার

উপর ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিলে আরও অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। সকল কার্য্যেই শান্তভাব (Temperence) থাকিলে আমরা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারি। Temperence শিখিতে বিশিষ্ট শক্তির আবশ্যক, কারণ ইহার মূল ধৈর্য্য, ধৈর্য্যের মূল শক্তিপ্রয়োগ। শক্তিই সুখের মূল, শক্তিই সন্তোষের মূল, শক্তিই জয়লাভের মূল। Temperence থাকিলে উচ্চ আশা হয় না, মদ মাৎসর্য্য থাকে না, স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় না, সংশয় থাকে না—বাস্তবিক যে গুলি স্থির সুখের উপকরণ সেই গুলিই অবিকৃত থাকে। তাই Bain এর মুখে Plato বলিয়াছেন "The conditions of happiness are not wealth and power but justice and temperence"। সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিতাবস্থায় মনস্থির রাখিতে যত শক্তির প্রয়োজন তত আর কিছুতেই নয়—এই মনঃস্থৈর্য্য কালে মন একপ্রকার অপূর্ব্ব শক্তি দ্বারা আবেশপ্রাপ্ত হয়—সেই শক্তির পরিণতাবস্থায় যে স্ফূর্ত্তি তাহাই আনন্দ—তাহাই বিশুদ্ধ ও বিমল আনন্দ। এই কারণ বশতঃ আমরা অশিষ্টাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলে এক প্রকার মানসিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। সে আনন্দটুকু আমাদের নিজের সম্পত্তি—অন্য লোকের নয়। আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াও পরের এই রূপ আনন্দ আমরা নিজে অনুভব করিতে অসমর্থ হই। কারণ যে শক্তিটি অবস্থাবিশেষে তাহাকে চালিত করিতেছে সেটি আমাকে ঠিক সেই অবস্থায় চালিত করিতেছে না। এই হইতেই সহানুভূতির সৃষ্টি—কারণ সহানুভূতির কারণ ও অবস্থা এক। সেই জন্যই দেশভেদে, জাতিভেদে, বিদ্বেষ দৃষ্ট হইলেও সহানুভূতি বিজাতীয়দিগের মধ্যেও অত্যন্ত প্রবল। এক্ষণে আমরা দেখাইলাম কিরূপে ক্রোধসংবরণাদি কাজে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ও কি কারণে আমরা অন্যের দোষে সাধারণতঃ অন্ধ হইয়াই থাকি।

তিন'খানি ছবি।

(১)

প্রলয় পবনে উড়িছে গগন
ওড়ে রবি শশী তারা,
উড়িছে ভূধর ওড়ে মহাসিন্ধু
ওড়ে হ্রদ নদীধারা;
রাজ্য মহারাজ্য পশু পক্ষী কীট
মানব মানবী ওড়ে,
উড়িছে ধরণী উড়িছে জগৎ
ব্যোম অন্তঃ শূন্য ক'রে।
মহাশূন্য পারে দাঁড়া'যে রমণী
বদনে করুণা ঝরে,
প্রসারিয়া বাহু আকুল জগতে
হৃদয় মাঝারে ধরে।
ছায়াময় হ'য়ে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড
সে হৃদয়ে হয় লীন,
অন্য প্রান্ত হ'তে হেরে যুবা তাঁয়
নয়ন পলক-হীন।

---

(২)

সাগর হৃদয়ে তরঙ্গ ভেদিয়া
উঠিছে রমণী ধীরে,
চৌদিকে তাঁহার উত্তাল তরঙ্গ
বিস্ময়ে পশ্চাত ফেরে।
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ প্রসারিয়া
পরশি তরঙ্গদ্বয়,

অপূর্ব্ব কিরণে বিভাসিয়া সিন্ধু
রমণী উদয় হয় ;
নিবিড় চিকুর পড়েছে ছড়া'যে
প্রসারি সুদূর জলে,
উন্নত উরস করিয়া পরশ
সাগর-হৃদয় টলে ;
রবি শশী তারা গ্রহ অগণন
দাঁড়াযে আকাশময়,
বিস্ময়ে পূরিয়া অনন্ত জগৎ
রমণী উদয় হয়।

---

(৩)

(Ovid's) metamorphose এর অনুকরণ)

দাঁড়ায়ে রমণী অনাবৃত দেহ
ঊর্দ্ধে বাহু প্রসারিত,
অর্দ্ধ ভুজ দ্বয় শাখায় পল্লবে
ঝাউ বৃক্ষে পরিণত ,
স্খলিত চিকুর ঊর্দ্ধে প্রসারিত
অর্দ্ধভাগ তরুকায়,
লজ্জা—বিভীষিকা— বিস্ময়—যন্ত্রণা
নেত্রে ফুটি বাহিরায ;
প্রফুল্ল উরস মর্ম্মর আকারে
হইতেছে পরিণত,
কটি বস্তি উরু জানু জঙ্ঘা পদ
ক্রমে ক্রমে শৈল মত।
সম্মুখে যুবক বিস্মিত নয়নে
সেই রূপান্তর হেরে,

না পাবে ধরিতে না পাবে সরিতে
দুই নেত্রে অশ্রু ঝরে,
চিত্রপট-অর্থ দুই ছত্রে লেখা
আলেখ্যের নিম্নদেশে,
"পাষাণীর মত করেছিলে পণ
পাষাণী হইলে শেষে।"

ঈশান।

কাব্যের বর্ণনা।

বর্ণনা অনেক প্রকারের আছে। কোন প্রকার বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয়টি যেন প্রতিলিখিত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পড়ে—কোন প্রকার বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয়টির সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যই প্রতিভাসিত হইয়া থাকে—মূল বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণিত হয় না. আবার কোন প্রকার বর্ণনা বর্ণিত বিষয়টিকে কেবল মাত্র বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। এ সকল বর্ণনার একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, স্থানচ্যুত হইলেও ইহাদিগের সৌন্দর্য্য অবিকৃতই থাকে। যেখানে সেখানে ইহার যোজনা করা যায়, যেখানে সেখানে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের বর্ণনা আছে—সে বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই প্রায় অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া উহাকে সমধিক শোভান্বিত করে, নিজেও সমধিক শোভান্বিত হয়। কিন্তু একপ বর্ণনা একেবারে স্থানচ্যুত করিলে, ইহার শোভা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে—একপ বর্ণনা যেখানে সেখানে সংযোজনা করিতেও পারা যায় না। একপ বর্ণনাই প্রকৃত কাব্যের বর্ণনা। অন্যবিধ বর্ণনা যে কাব্যের শোভা সম্পাদন করে না, একপ নহে, তবে সে গুলি ঠিক কাব্যের বর্ণনা নহে—সাধারণ বর্ণনা, শোভা সম্পাদনার্থ কাব্যে স্থান পায় মাত্র। মূল কাব্যের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।—বলা বাহুল্য যে, আমরা কাব্য শব্দে

কাব্য গ্রন্থই অভিহিত করিলাম—যাহাকে সচরাচর কাব্য বলে, কাব্যের সেই সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইহা ব্যবহার করিলাম।

উপরে যাহাকে কাব্যের বর্ণনা বলা হইল, আজি প্রচারের পাঠকবর্গ সমীপে তাহার ৪টি বর্ণনা উপস্থিত করিলাম। বর্ণনা কয়টি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তাই সে আনন্দের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল। যদি পাঠকবর্গের অরুচিকর না হয়, তবে পুস্তকান্তর হইতে এরূপ আরও বর্ণনা উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

আর একটি কথা না বলিয়া প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদিগের ২। ১ মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে, উহা কেবল মাত্র আমাদিগেরই সন্তোষ জন্য—হৃদয়ের আবেগে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত বর্ণনার শতাংশের একাংশ সৌন্দর্য্যও ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা পরিস্ফুট হইতে পারে না, ও হয় নাই।

(১)

নবকুমারের সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নবকুমার সেই লোকালয়শূন্য বালুকাস্তূপশ্রেণী মধ্যে বসিয়া একাকী, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, তাঁহার জঠর জ্বলিতেছিল, কিন্তু সে কষ্ট দূর করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। "দুরন্ত শীতনিবারণের জন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে হিমবর্ষী আকাশতলে নিরাশ্রয়ে নিবারণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। হয় ত রাত্রিকালে ব্যাঘ্র ভল্লুকে, প্রাণনাশ করিবে। অদ্য না করে কল্য করিবে। প্রাণনাশই নিশ্চিত। এই রূপ চিন্তাকুল হইয়া মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

"ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল-কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।"

কি অপূর্ব্ব দৃশ্যপটই প্রস্তুত হইল। দৃশ্যটী যেন নবকুমারের অবস্থার

সহিত—নবকুমারের চিন্তার সহিত এক লয়ে বাঁধা। ইহা ত যেন সহজেই পাঠকের মানসপটে সমুদিত করা যায়, কিন্তু "শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল"—ইহা বুঝান আমাদিগের সাধ্যাতীত। কথাগুলি যেন ঠিক সেই আকাশের নক্ষত্রাবলীর ন্যায় নীরবে এই বর্ণনামধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার কোন্ কথা ব্যাখ্যা করিব? 'শিশিরাকাশে'? 'নীরবে'? না, 'ফুটিতে'? ইহার কোন্ ভাব ব্যাখ্যা করিব? সেইরূপ সমুদ্রতীরস্থ নির্জ্জনপরিত্যক্ত আশাশূন্য নবকুমারের নিকট সেই শূন্য প্রদেশের নীরবের নক্ষত্রোদয়? না, সেই নক্ষত্রোদয় দেখিয়া নবকুমারের সেই চিরপরিচিত স্বদেশের নক্ষত্রোদয়ের নীরব স্মৃতি—সেই "যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে তেমনি ফুটিতে লাগিল?" ইহার ব্যাখ্যা? ভাবের ব্যাখ্যা করিব, না, সেই ভাব প্রকাশের অপূর্ব্বশক্তি ব্যাখ্যা করিব? আমরা কিছুই করিব না—কিছুই করিতে পারিব না। এ সঙ্গীত আমরা গাহিতে অক্ষম—তাই কেবলমাত্র সঙ্গীতটির স্বরলিপি লিখিযাই ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহারা আমাদিগেরই মতন গাহিতে না জানেন, তাঁহারা মৃদুমধুর নিনাদে সেতারঝঙ্কারবৎ এ সঙ্গীতের ধ্বনি মানসকণ্ঠে উত্থিত করিয়া সুখানুভব করুন। আর যদি কেহ এ সঙ্গীত গাহিতে জানেন, গলা ছাড়িয়া মধুর ভৈরবে ইহার সুস্বররাশি এইরূপ আকাশের দিগন্তে ভাসাইতে পারেন, তাঁহারা সাধ পুরাইয়া তাঁহার সঙ্গীত-ক্ষমতার সার্থকতা লাভ করুন;—আমরা দূর হইতে অনন্যকার্য্য—অনন্যমনা হইযা তাহা শ্রবণ করি; শুনিয়া শুনিয়া সংসারতাপে জর্জ্জরিত এ শ্রান্ত হৃদয়খানিকে একবার সেই নবকুমারের মত তন্দ্রাভিভূত করি। হায়, ইহা কি কেহ গাহিবে না?

২

নবকুমার ফলমূলান্বেষণে এক নিবিড় বনমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, পথ চিনিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন না। এমন সময়ে,

"গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল, তিনি বুঝিলেন যে এ সাগর-গর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্যে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয়

পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপকৃত বিমলকুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায়; সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌ জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল। কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি তৎকালে সময়—পরিমাণ—বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে আশ্রম সন্ধান করিতে হইবে, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। * * * গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন— "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্র পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াহীন চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশ রাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহু-যুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।

মনোহর দৃশ্যপট। এখানেও আমরা সেই সাগর বর্ণনা, সেই সাগরতীরস্থ সুন্দরী বর্ণনা, সেই একের সৌন্দর্য্যে অপরের সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—

ইহার কিছুই বলিব না। আমরা বলিব সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে; সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দণ্ডায়মান কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তির সহিত, নবকুমারের তাৎকালিক হৃদয়ের সেই অপূর্ব্ব লয়ের কথা—সেই অপূর্ব্ব সুর-সংযোজনার কথা। অনন্তবিস্তৃতা নীলবসনা বারিধি দেখিয়া নবকুমারের কাব্যময় হৃদয়ে স্বতঃই একরূপ অস্পষ্ট অজ্ঞাতচরিত্র সুখের মৃদু হিল্লোল প্রবাহিতেছিল। সেই সন্ধ্যালোকের ন্যায় সেই আধভাঙ্গা অস্পষ্ট সুখ-স্বপ্ন লইয়া যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তদবস্থ দেখিলেন—স্বপ্ন পূর্ণ হইল, অস্পষ্ট স্পষ্ট হইল। সে সুখের সহিত এ সুখ যেন বিনা ওজরে মিশিয়া গেল। সঙ্কিত উপলরাশিবিভক্ত সলিলরাশি যেরূপ উপলোন্মোচনে মিলাইয়া যায়, নবকুমারের সেই সমুদ্র দর্শনজনিত মনোভাব যেন কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষজনিত চিত্তভাবের সহিত মিলাইয়া গেল। নবকুমার এক সমুদ্র পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন,—আর এক সমুদ্র সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই তেমনই শোভান্বিত, তেমনই চিত্তমোহকারী, তেমনই চিত্তভাববিশ্লেষী!

(৩)

দৃশ্যটির রেখাপাত মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিব। কপালকুণ্ডলা শ্যামার জন্য ঔষধ আনিতে বনমধ্যে গমন করিতেছেন—উপরে চন্দ্রমা হাসিতেছে, নিজের স্নিগ্ধ কিরণরাজি নিশীথ জগতের ক্রোড়ে অকাতরে ছড়াইয়া দিতেছে। কি অপূর্ব্ব সুর মিলিল—সেই স্নিগ্ধ রশ্মিময়ী চন্দ্রমাশালিনী মাধবী যামিনীর সহিত কপালকুণ্ডলার সেই পরোপচিকীর্ষার কি অদ্ভুত মিলন হইল। দেখিয়া দেখিয়া আবার কপালকুণ্ডলার সেই অতীতস্মৃতি কেমন সুন্দরভাবে সুরে মিশিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সঙ্গীত করিতে লাগিল। আবার ঘটনার পীড়নে যখন কপালকুণ্ডলা অন্যরূপ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন—চন্দ্রমা লুক্কায়িত হইল, আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিন্ন সুরে আবার আর একটি সঙ্গীত গীত হইল। ইহার পরে যখন "বিদ্যুতালোকে" কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণভূমিতে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘকায় পুরুষ—সেই কাপালিক, সুর পঞ্চমে উঠিল। ইহাকেই কাব্যের বর্ণনা বলে।

(৪)

কপালকুণ্ডলা শ্মশানভূমিতে আনীতা হইয়াছেন। পাঠকবর্গ একবার সেই দৃশ্যটি স্মরণ করুন। শ্মশানের কথা বলিতেছি না—শ্মশানে সেই কাপালিকের সেই ভবানীপূজার কথা বলিতেছি না—সেই শ্মশানপথে কিরূপ করিয়া নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, তাহার কথাও বলিতেছি না—সেই নদী আর সেই নদীতীরস্থ সেই নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কথা বলিতেছি। কথা কহিতে কহিতে উভয়ে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "বিশাল তরঙ্গিনীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্রমাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল, তাহার কারণ তরঙ্গাভিঘাত জনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল।" দম্পতির হৃদয়ের সহিত এই তরঙ্গিনীর কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে পান কি? নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার হৃদয়েও কি সেই রূপ করিয়া অপ্রতিহত বেগে চৈত্রবায়ু প্রধাবিত হইতেছিল না? কে বলিবে। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া কপালকুণ্ডলা ভৈরবী আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য যখন পঞ্চভূতের বিষম বন্ধনটিও ছিঁড়িবার কথা ভাবিতেছিলেন ছিঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন যে তাঁহার হৃদয়খানি ঐ তরঙ্গিণীর মত বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গময় হইতেছিল না কে বলিবে? যখন নবকুমার আপনার হৃৎপিণ্ড সদৃশ প্রিয়তমাকে জীবিতাবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে—আত্মহস্তে ছেদন করিতে সংকল্প করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, এই চৈত্রবায়ুপ্রক্ষিপ্ত তরঙ্গাদির ন্যায় তখন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় নাই, কে বলিবে? আবার দেখুন, যখন ধীরে ধীরে নবকুমারের চৈতন্য হইতেছিল, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে রমণীসুলভ দয়ার ভাব বিকাশ পাইতেছিল,—সম্মুখস্থ নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। কপালকুণ্ডলা যখন হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই,' যখন নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিতেছিলেন 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ—গৃহে চল।' তখন সেই নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইতেছিল। আবার যখন কথা কহিতে কহিতে কপালকুণ্ডলার সেই ভবানীর আজ্ঞা মনে পড়িল, বলিলেন, 'ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও। আমি

মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না' এবং নবকুমার 'না—মৃণ্ময়ি!—না!' —এই রূপ উচ্চশব্দ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন—'চৈত্র বায়ু বিতাড়িত এক বিশাল নদীতরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তট-মৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।'—বর্ণনার পরাকাষ্ঠা হইল।

সন্ধ্যায়।

দেবকুমারী ও বিজয়।

দেব। বিজয়, সন্ধ্যা হ'ল যে!—দিন কি তবে ফুরিয়ে এল? সংসারের খেলায় দাঁড়ি প'ড়ল? বিজয়, শৈশবের দিন কি আর ফিরে আসে না? শৈশবে পা, কেমন, কত দ্রুত চলিত। এখন পা আর চলে না কেন? এখন পদে পদে কত বাধা। সংসার, কারাগার।

বি। দেব, গোলাপ ফুট্‌লে পর, তার কাঁটা গুলো ঝরে পড়ে না কেন? এ জ্যোৎস্না-মাখান সুখের গঙ্গায় পূর্ব্বস্মৃতির ভাঁটা কেন? জীবন থাকিতে দিন ফুরাইয়া আসিবে কেন? আর সন্ধ্যা? আজ ত নূতন নয়। প্রতি-দিনই ত সন্ধ্যা আসে-যায়? জগতের সূর্য্য অস্তমান বটে। কিন্তু তোমার সূর্য্য, তোমার জগতের সন্ধ্যায় এখন ত অস্ত যায় নাই। সে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া জাগিয়া আছে। (আপনার মনে) এত দিনের পর আজ এ চিন্তা কেন? সুখের আকাশে দুরাশা-স্বপ্নের ছায়া কেন?

দেব। (উদাস নয়নে) না বিজয়, দেরী আর নাই!—যাবার সময়ের আহ্বান চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে। (হায় পুরুষ! তুমি কি অন্ধ! নারীর মন কিছু বোঝ না। নারী-জীবনের রহস্য, তোমাদের চোখে চির-অন্ধকারই রহিয়া গেল!)

বি। কি বল্‌চ তুমি? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে? কাল বুঝি

কথাগুলো মুখস্থ করেছিলে? দেখ, সন্ধ্যা আমার বড় ভাল লাগে। সন্ধ্যার গীতোচ্ছ্বাস বড় মর্ম্মস্পর্শী। সন্ধ্যার কবিতা সকলে পড়িতে পারে না। তাহা বড় গভীর—জগৎব্যাপী, জগতাতীত। তাহা জগতের স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্ন। সন্ধ্যায় অনন্তের খেলা। সন্ধ্যায় তারা ফুটে, চাঁদ হাসে, প্রকৃতি জাগে। স্বর্গেরা আনাগোনা করে। ফুলেরা সাড়া দেয়। সন্ধ্যায় প্রকৃতি কথা কয়। সন্ধ্যা প্রকৃতির সচেতন ধর্ম্ম। সন্ধ্যায় প্রকৃতির কাজের আরম্ভ। প্রকৃতি, দিবসে মানুষের। সন্ধ্যায় মানুষ প্রকৃতির। দিবসে আপনাকে চিনা যায় না, বুঝা যায় না। সন্ধ্যায় আপনাকে চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি এই বিরাট অসীম প্রকৃতির কাছে আমরা মানব কত—কত ক্ষুদ্র। দিবসে আপনাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। সন্ধ্যায় তাহার ঠিক বিপরীত দেখি। দেখি, আমরা প্রকৃতির কৃপার পাত্র, ক্রীড়নক। দিবসে আমরা বাহ্য কাজে রত থাকি। তখন যা-কিছু করি, তাহা কেবল বাহ্যজগৎ লইয়া। অর্থাৎ তাহা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয়। তখন গৃহই সর্ব্বে সর্ব্বা, জগৎ হইয়া উঠে। আর সন্ধ্যায় আমরা আধ্যাত্মিক মর্ত্ত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যে, অতি-জগৎ রহিয়াছে, সেই জগতে তখন প্রবেশ করি। অসীমে ব্যাপ্ত হই। একে-অসংখ্য হই। এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে গৃহরূপে দেখি। দিবসে আমরা মানুষ। সন্ধ্যায়, দেবতা। এমন চিরযৌবনা সন্ধ্যায়, এই অসীম সসীমের মিলনের মুখে, তুমি অসুখী হচ্ছ? যাহারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনে জীবন অর্পণ করেছে, তাহাদের সন্ধ্যা ভাল লাগে না? আশ্চর্য্য! যতদিন মানুষ, প্রকৃতিকে না বুঝিতে পারিবে, প্রকৃতির সহিত সমান ভাবে না মিশিতে পারিবে, ততদিন মানুষ, মানুষের শিক্ষা, অসম্পূর্ণ। মানুষ, অসম্পূর্ণ। প্রকৃতিকে লইয়া সে পূর্ণ। জগতে কবি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন? প্রকৃতির নাড়ীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে বলিয়া। প্রকৃতির প্রেমে প্রেমিক হইতে পারে বলিয়া। এই প্রকৃতি-ধনে কবি, ধনী-শ্রেষ্ঠ, মহাধনী। জগতের পূজনীয়। এই প্রকৃতির তালে চিরদিন নৃত্য করিতে পারে বলিয়াই কবি, অমর। দেবকুমারী, প্রকৃতির জীবন্ত মূর্ত্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাবে-অঙ্কে জন্মিয়া, ফুটিয়া, তোমাতে প্রকৃতি-জ্ঞানের অভাব দেখি কেন? প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রকৃতির ভাব, বোঝ না কেন?

দেব। বিজয়, আমার জগৎ-বন্ধন, ইহজীবনের সুখের একমাত্র মূল, বল-দেখি, সুখের সুর একঘেয়ে কেন? প্রতিপদক্ষেপে সুখের বৈচিত্র্যহীন কাঁটা পায়ে বিঁধে কেন? সুখে আর সুখ নাই। সুখের সেবা আর ভাল লাগে না। সুখ আমার অস্বাস্থ্যকর হয়েছে। সুখের জন্য সুখ কে চায়? সুখের জন্য সুখ নয়। বাঁচিবার জন্য সুখ। অনন্তকে পাইবার জন্য সুখ। সুখে বাঁচা যায় কৈ? সুখের তরণীতে চাপিয়া, জীবন-সমুদ্র পার হওয়া যায় কৈ? সুখের তরণী বড় ভারী। অনেক যাত্রী এই সুখের তরণীতে চাপিয়া জীবন-সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। পরপারে যাইতে পারে নাই। জীবনের পরপারে সুখের নৌকায় যাওয়া যায় না। তবে সুখ আর কেন? জীবনের পারে আমাকে কে লইয়া যাইবে? সুখের পাপ শিকল যার পায়ে বাঁধা, সে কখন কি অসীমে যাইতে পারে? গৃহের বাহির হইতে পারে? বিশ্বের মাঝখানে আসিয়া বিশ্ব-প্রাণে প্রাণ মিশাইতে পারে? অসীমের জগত বন্ধনাতীত অবিশ্রাম আহ্বান, সে কি-শুনিতে পায়? বিজয়, এতদিন ধরিয়া তুমি আমায় যাহা শিখাইয়া আসিলে, আজ তুমি নিজে তাহা ভোল কেন? আজও সুখের দিকে এত ঝোঁক কেন? আজও ভোগের আকাঙ্ক্ষা কেন? প্রকৃতির মধ্যে অপার আনন্দ আছে বটে। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, ভোগের বাসনা, সদা অতৃপ্তিকর ব্যাকুলতা কোথায়? মানবের ভোগ-সুখ-জাত আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতিজাত আনন্দের তুলনা হয় কি? যে সুখ তুমি চাও, প্রকৃতি তাহা দেয় না। প্রকৃতির সুখ, বিমল, অনন্ত, পরার্থপর। প্রকৃতির সুখ, কাহাকে ডাকে না, হাসে না, কাঁদে না, মায়ার জাল পাতে না। প্রকৃতির সুখ, দুর্লভ। সকলে তাহা পায় না। যাহারা আত্মার অচেতনতা ঘুচাইতে পারিয়াছে, জড়ে ও আত্মায় বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষা, জগতের অনন্ত ঐক্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারে, তাহার মূল পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহারাই প্রকৃতির সুখ-লাভে সমর্থ। বাসনার ছাই গায়ে না মাখিলে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যগত স্থায়ী সুখ লাভ করা যায় না। বিজয়, স্বামিন, দিন দিন তুমি এত আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? এত পিছিয়ে পড়্‌ছ কেন? জীবনের যে এখন সমস্ত পথই বাকি। তুমি একা এ সুদীর্ঘ পথ-চিহ্নহীন-পথ কি করিয়া চিনিয়া যাইবে? কে তোমাকে আলো ধরিবে? আমার অন্ধকারের আলো

তুমি। তোমার অন্ধকারের আলো আমি। পথে দু'আলোরই প্রয়োজন তাহা না হইলে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছান যায় না। পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। যদি বা অতি কষ্টে পৌঁছিলাম, তাহাতে কোন কাজ হ'ল না, কোন ফল ফলিল না। যে পর্য্যন্ত সঙ্গী না আসে ততদিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সঙ্গী আসিলে তবে কার্য্য আরম্ভ হয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরে চিরদিনের সঙ্গী। তাহারা অনন্তকালের জন্য একসুরে বাঁধা। প্রেমের আদর্শ স্বামী-স্ত্রীতে। বাহিরে আমরা দু'জন দেখিতে। ভিতরে দুই এক। এক আত্মা—এক মন—এক ইচ্ছা—এক কার্য্য। প্রাণাধিক, জ্ঞানের ভ্রান্তি আমার, না তোমার?

বি। দেখ, পৃথিবীতে থাকিতে গেলে সুখ চাই। পৃথিবীতে থাকিয়া মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া, সুখের অনুসন্ধানে বিরত কে? সুখই এ পৃথিবীর একমাত্র সম্পত্তি। পৃথিবীতে সেই শ্রেষ্ঠ, যে সুখী। সুখের জন্যই মনুষ্য-জন্ম। জগৎকে সুখের ইন্দ্রালয় করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাহাই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সুখের কথা সকলের মুখেই শুনা যায়। সুখের অর্থ অনেকে অনেক রকমে করিয়া থাকে। সুখ কি? আমি জানি না, ঠিক বুঝি না। সুখের সন্তোষজনক দর্শন শাস্ত্র কোথাও পাওয়া যায় না। আজও উদ্ভূত হয় নাই। তবে ইহা বুঝিতে পারি এবং দেখিতেও পাই যে, বাহ্যজগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, অন্তর্জগতে তেমনি সুখের আকর্ষণ। দুয়ের আকর্ষণই সমান। প্রতিপদে মানুষকে টানিতেছে। প্রতিপদেই তাহাদের আকর্ষণ বাড়িতেছে। সুখের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। সুখের অনিবার্য্য আকর্ষণ হইতে আপনাকে ছাড়ান, দূরে রাখা, বড় কঠিন। মানবের তাহা সাধ্যাতীত। সুখের সোহাগময় প্রাণ-উদাসী বাঁশী "রাধা রাধা" স্বরে অবিরাম বাজিতেছে। সে রবে পৃথিবী মুগ্ধা, পাগল। মানুষ, চির-বিরহী। বাঁশী কোথা বাজিতেছে, কে বাজাইতেছে, কে জানে? কিন্তু তাহা "কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিয়া মোর প্রাণ।" সে বাঁশী দেখা যায় না. তাহা দেখিবার নয়। কেবল শুনিবার ও অনুভব করিবার। সেই অনুভূতিময় স্বর্গের সাড়াপাওয়া বাঁশীর ডাকে

চলিয়াছি। কোথায় যাইতেছে, জানিনা। আবার এই সুখই সমাজ-বন্ধন। জগতে একাকী থাকা যায় না। একা থাকিয়া সুখী কে? জগৎকে লইয়া সুখ। পরিবারের সকলকে লইয়া সুখ, সুখের জীবন। সুখী-হইতে গেলে কাহাকেও ছাড়িতে পার না। সুখের নিন্দা করিও না। মানুষ হইয়া সুখের নিন্দা কর কি বলিয়া? বল দেখি, তুমি কি চাও? কিসের জন্য তোমার প্রাণ সদা ব্যাকুল? এই যে আজ তুমি জগতের সকল বস্তুতেই অতৃপ্তি, অপূর্ণতা, অশান্তি অনুভব করিতেছ, তাহার মূল, কারণ জান কি? কি পাচ্ছ না? সুখ। তুমি অসুখী। তাই জগতের চারিদিকেই সুখের অভাব দেখিতেছ। তাই জগতের মধ্যে সুখের চির-নূতন চির-তৃপ্তিকর নানারূপময় মধুর প্রেম-গীতি শুনিতে পাইতেছ না। আর সুখইত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সুখ না থাকিলে কি মানুষ কখন বাঁচিত? তুমি যে বলেচ "সুখে বাঁচা যায় কৈ?" ও কথাটা তোমার মস্ত ভুল। তোমার সুখ, আমি বুঝিয়াছি। তোমার সুখ সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত। তুমি খুঁজিতেছ, আপনার সুখ। আপনার সুখের মধ্যে সুখের পূর্ণতা, সুখের বিশ্বজনীন অপার আনন্দ নাই। সুখের পরিপূর্ণতা, সুখের চিরদিনের আনন্দ, বিশ্বের অসীম প্রাণের ভিতরে। সুখের সীমা এককাঠা জমি নহে। যথার্থ সুখ পাইতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই। তুমি ত জগতের সুখের দিকে একবারও চাইচনা। বিশ্বের নিয়ম আদান-প্রদান। সুখ দিলে তবে সুখ পাওয়া যায়। তুমি যদি জগৎকে সুখ না দাও, জগৎ তোমাকে সুখ কেন দেবে? আপনার প্রাণের মধ্যে সুখ কোথায়? বিশ্বের প্রাণের সহিত আপনার প্রাণ মিশাও। সুখী হইবে। ভূমানন্দলাভ করিবে। আপনাকে আপনার মধ্যে জড় করিতেছ বলিয়াই ত পৃথিবীর কিছুতেই সুখ পাও না। কথাটা বোঝ। মানুষ পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ রাখিতে পারে না। মানুষ জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ। জগৎ হইতেই জন্মিয়াছে, আবার জগতের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইবে। সেই ক্ষুদ্র মনুষের সুখ-দুঃখ জগতের সুখ-দুঃখ লইয়া। জল-বিন্দু অপেক্ষা সমুদ্র কত বড়। তোমার সুখের চেয়ে জগতের সুখ কত বড়। জল-বিন্দু যদি মনে করে, আমি সমুদ্রকে ছাড়িয়া থাকিব।

আমি সমুদ্র হইব। তাহা হইলেই সে ক'দিন বাঁচে? সে সমুদ্র হ'তে পারে কি? সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সমুদ্র হইতে হইবে। সমুদ্রকে ছাড়িয়া সমুদ্র হইবার ক্ষমতা জল-বিন্দুর নাই। সমুদ্রকে ছাড়িয়া সমুদ্র হওয়া যায় না। তাই বলি জগতের প্রতি জগতের সুখ বাড়াইতে মন দাও। জগৎকে ভালবাস। আমিই কি তোমার সব? আমিইকি তোমার জগৎ? আমাকে সুখী করিলেই কি জগৎকে সুখী করা হ'ল? আমাকে অতিক্রম করিয়া কি জগৎ নাই। আমি যে তোমার আলো, আমি যে তোমার সাহায্য, তোমার এ জীবনের একমাত্র স্বামী, তাহা কিসের জন্য? কেবল কি তোমার নিজের সুখের জন্য? তোমাকে কেবল আমার মধ্যে পুরিবার-জন্য? না। আমার মধ্যে মরিবার জন্য তুমি আস নাই। আমার আলো তোমাকে অনন্তপথে অগ্রসর করিবা দিবার জন্য। তোমার আমার প্রতি ভালবাসা, জগৎকে ভালবাসিবার জন্য। আমি তোমার অনন্ত সুখের দ্বার মাত্র। তোমার সুখের অনন্ত পথ দেখাইযা দিতেছি। আমি তোমার স্বর্গও নহি। তাহার সিঁড়ি মাত্র। তুমি যে বলিযাছ, "বিশ্বের মাঝখানে আসিযা বিশ্ব-প্রাণে প্রাণ মিশাইতে হইবে।" সে কথাত আমিও বলি। কিন্তু তাহা কিরূপে? তাহা কি মানবকে দূরে রাখিযা? মানবের সঙ্গে না মিশিয়া? তুমি বিশ্বকে মানব থেকে তফাৎ করিয়া দেখিতেছ। তা'ওকি কখন হয? বিশ্বের সার অংশ মানব। বিশ্ব হইতে মাবকে বাদ দিতে পার না। যদি বিশ্ব-আত্মায প্রাণ মিশাইতে চাও, তবে সমস্ত মানবের প্রাণের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। যাহা তুমি চাও, যে perfections'র জন্য তুমি ক্রমাগত চেষ্টাকরিতেছ, তাহা humanity 'র মধ্যে। humanity কে জাগাতে হইবে। humanity কে জাগাতেগেলে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আবশ্যক। বিশ্বব্যাপী প্রেমের প্রভাবেই humanity জাগিবে। প্রকৃতিকে পাইবে। সুখী হইবে। অনন্ত বিশ্বময় জীবনলাভ করিবে।

দেব। বিজয়, জীবন-তত্ত্ব, জগৎ-রহস্য-কথা তাহার আদ্যন্ত মধ্য, তোমার কাছ থেকে অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। এতকাল ধরিয়া তোমার জ্ঞানের সুন্দর কথা গুলির গভীর ভাবে আলোচনা করিলাম। অধিক কি, তোমার ভাবেই আমি অনুপ্রাণিত। তবু সত্য কথা বলিতে গেলে, তোমার ওসব

পাশ্চাত্য-ভাব-ঘেঁসা-কথা, আজও আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ওসব কথা গুলাকে আজও আমার অস্থি-মজ্জা করিতে পারিলাম না। প্রাণ ধরিয়া তুলিতে পারিলাম না। উহা হইতে পরলোকের জন্য সঞ্চয় করিবার কিছুই পাইলাম না। উহা জীবন-পথে আমাকে এক পা’ও অগ্রসর করিয়া দিল না। অত বড় বড় উদার কথা, যাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, তাহা বহিব কিরূপে? আমরা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক থাকিবে। তাহাকে তুমি যতই শিক্ষিত করনা কেন। চিরকালই সে অবলা —আত্মময়ী। সেই জন্য স্ত্রীলোকের কাজ, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের কাজ, পুরুষের কাজের ঠিক উল্টো। জগৎময় হওয়া, জগৎকে দেখা, জগতের স্রষ্টা হওয়া, পুরুষের ধর্ম্ম, পুরুষের কাজ। নারীর নহে। তুমি পুরুষের দিক হইতে নারীকে দেখিয়াছ। পুরুষের কাজকে স্ত্রীলোকের কাজ বলেছ। নারীর ধর্ম্ম কি? নারীর সমস্ত জীবন, স্বামী ও ঈশ্বরের অনুগামী হওয়াই ধর্ম্ম। তাহাই নারীর এক মাত্র শিক্ষা। নারীর কাজ গৃহ প্রতিষ্ঠা করা। গৃহিণী হওয়া। গৃহে স্বামীরূপ চির-প্রিয় সজীব মঙ্গলময় দেবতার নিত্য পূজা করিতে করিতে, সেই তাঁহার—যিনি আমার স্বামীর স্বামী, সকলের দেবতা,—পূজা-পদ্ধতি-প্রেম, শিক্ষা করা। স্বামী-রূপ সসীম ধ্রুবে অচল থাকিয়া, সেই অসীম মহা-ধ্রুবের দিকে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করা। আমরা অহর্নিশ—দূর হইতে—জগতের মঙ্গল কামনা করি। পুরুষকে জগতের কাজে উৎসাহিত করি। পুরুষের কাজের অংশ লইয়া জগতের মঙ্গল করা, কাজ করা, নারীর ক্ষমতার অতীত। নারী তাহা পারে না। পুরুষের সহিত কি নারীর তুলনা হয়? নারী অচৈতন্য, পুরুষ চৈতন্য। নারী দেহ, পুরুষ আত্মা। সেই স্বামী আত্মার মধ্যদিয়া নারী মহা-আত্মায় প্রবেশ করিতে চায়। আর কিছুই সে চায় না। বিজয়, আমাদের দিন ফুরাইয়াছে। আমাদের অত সব কথায় কাজ কি। যাহাদের এখন দিন আছে, তাহারা ওসব কথা লইয়া নাড়া চাড়া করুক। চল ঈশ্বরে জীবন সমর্পণ করি। আর গৃহ কেন? জীবনের গৃহ-অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। পরলোক অধ্যায় সম্মুখে বিরাজমান। দেখ, এত বড় এই আকাশে-মেশা সাগরে-ঘেরা শত ফুল-হাসি-রঙ্গের ছড়াছড়ির সুখের বিচিত্র পৃথিবীতে মানবের খেলা

দু'দণ্ড মাত্র। প্রতিদিন অভ্যাস-সূত্রে কত খেলাই খেলিতেছি। প্রত্যহ নূতন নূতন আশা লইয়া জগৎ-মহারণ্যের ফুলে ফুলে পাগল হইয়া মধু অন্বেষণে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছি। জগতের চারিদিকে মায়ার অনন্ত শয্যা পাতিযা গভীর আত্ম-বিস্মরণ-নিদ্রায় মগ্ন আছি। হায়! তাহা কদিন? একবার চোখ বুজিলেই ত সব ফুরাইল! স্বপ্নের মত গেল! হায়! মানুষ পিছনে একবার চায় না! পিছনের জন্য কিছু রাখিয়া যায় না। সকলেই অধিকার বাড়াইতে দৌড়াইতেছি। অধিকার কোথায়? কিসের অধিকার? সুখের? তাহা অস্থায়ী—চঞ্চল। আশা? এখানে মিটে না। এ জগৎটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। এ জগতের ভিড়ে আমাদের স্থান নাই। জগৎ থেকে আমাদিগকে পালাতে হবে। জগতে স্বাধীনতা নাই, সুখ নাই। জগতের সুখ, জগতের স্বাধীনতা, আমি চাই না। তাহা পরলোকের পথের বাধা—কণ্টক। জগতের দাসত্বে বৃথা সময় যাইতেছে। জগতের দাসত্ব আর ভাল লাগে না। জীবন মহত্ব চায়। জীবনকে জগতের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া মহৎ করিগে চল। জগৎ-মলা, জগতের দূরে গিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। এখানে ঝাড়িলে মলা পুনরায় ঢুকিবে। জগৎ-মলা, জগতের ভিতরে বসিয়া ঝাড়া যায় না। জগতের বাহিরে ঝাড়িতে হয়। আর সময় নাই। সময় যত চলিয়া যাইতেছে, ততই যেন কিসের হাহাকার রব কোথা হইতে শুনিতেছি। শুনিতেছি, কে যেন আমার আপনার লোক, আমার অনন্ত কালের হারাণ সঙ্গী, আমার ঠিক পাশে বসিয়া কাণের কাছে কি এক স্নেহ পূর্ণ-মধুর ক্রন্দনের মৃদুভাষায় আমাকে অবিরত আহ্বান করিতেছে। কে সে?—সন্ধ্যা? জগতের অনন্ত সন্ধ্যা?

বি। না। তাহা মানবের অনন্ত অভাব। তাহা Humanity'র আকুল-আহ্বান। তাহা পৃথিবী যুড়িয়া এক প্রাণ হইবার বিপুল প্রাণগত চেতনা—প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সখি দেখন-হাসি।

সকাল হ'ল ঘুম ভাঙিল সখি দেখন-হাসি,
মুচ্‌কে হেসে মধুর ভাষে জিজ্ঞাসিল আসি।
কেমন সখি, বাগানে কি যাবি সকাল বেলা,
ফুটেছে ফুল ভ্রমর কুল কর্‌ছে ফুলে খেলা।
চাঁপা গাছে ফুটে আছে কত শত ফুল,
পুকুর পাশে গোলাপ হেসে হতেছে আকুল।
গাছের ডালে গায় কোকিলে, কতই সুধা ঢালে,
তৃণের আশে হরিণ আসে কতই পালে পালে।
তরুণ রবি—সোণার ছবি, সোণার হাসি দিয়ে,
ফুলের শিরে মুকুট ঘিরে দিচ্ছে সাজাইয়ে।
সুবাস আশে ফুলের পাশে সমীর ঘুরে ফিরে,
দোলায় লতা, গাছের পাতা কাঁপায় ধীরে ধীরে।
সেথায় গিয়ে ফুল তুলিয়ে বেছে মনের মত,
সোণার গায়ে দিব ছেয়ে সাজ্‌বে যেথা যত।
বৃন্দাবনে গোপীর সনে যে ফুল ল'য়ে সাধে,
কতই খেলা খেল্‌লে কালা কৃষ্ণচূড়া বেঁধে।
সেই ফুলেতে তোর চুলেতে খোঁপা বেঁধে দিব,
ফুলের বালা ফুলের মালা কতই পরাইব।
কানন মাঝে তেমনি সাজে 'বনদেবী' হ'য়ে,
হাস্‌বে তুমি দেখ্‌ব আমি প্রফুল্ল হৃদয়ে।
গিয়ে সেখানে কোকিলা সনে গাব খুলে গলা,
কেমন সখি, বাগানে কি যাবি সকাল বেলা?

শ্রীস্বর্ণময়ী দেবী।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

মধ্য ভারতবর্ষে নওগাঁও নামক স্থান উত্তেজিত সিপাহিদিগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তথাকার একদল ইউরোপীয় প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করেন। ভারতবাসীর পরোপকার গুণে ইহাদের কোনও রূপ অনিষ্ট হয় নাই। ১২ গণিত ভারতীয় পদাতিকদলের অধ্যক্ষ লেপ্টেনেণ্ট জ্যাক্সন্ পলায়ন বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন।—"মহোবা পরিত্যাগের পর মদনপুর (ছত্রপুর) নামক পল্লীতে আমাদের থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পথ দুর্গম হওয়াতে, বিশেষ ১০।১২ খানি গাড়ীতে অনেক গুলি মহিলা থাকাতে আমরা উক্ত পল্লীতে অবস্থিতি করিতে পারি নাই। সূর্য্যোদয় সময়ে আমরা জুরা নামক পল্লীতে উপনীত হই। এই খানে উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই মহোবার কলেক্টর কর্ন্ সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কলেক্টর সাহেব চিরকুবার রাজার নিকট হইতে ১০০০্ টাকা ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা ঐ টাকায় এই দিনই, আমাদের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল তাহাদের মে মাসের মাহিনা পরিষ্কার করিয়া ফেলি।

"সূর্য্যাস্ত সময়ে আমরা এলাহাবাদ হইতে বাঁদা যাওয়ার পথে আর একটি পল্লীতে উপনীত হই। * * * স্থানীয় লোকে আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে বিমুখ হয় নাই। তাহাদের দয়ায় ও তাহাদের সৌজন্যে আমাদের অনেক উপকার হয়। পরদিন দুই জন পথপ্রদর্শক আমাদের সহিত মিলিত হয়। ইহারা আমাদিগকে কালী নগর যাইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কালী নগর হইতে আমরা নাগোদ নামক স্থানে প্রস্থান করি।

"সূর্য্যাস্তের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অন্যান্য পল্লীবাসীর মধ্যে ৮।৯ জন লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এই ঘোরতর বিপ্লবের সময় ইহাদের প্রভুভক্তি বিচলিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। এ সঙ্কট কালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থনে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সাধনে ও গবর্ণমেণ্টের আদেশপালনে ইহাদের বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ

ছিল। যদি আমরা এই প্রভুভক্ত বন্ধুগণের দেখা না পাইতাম, তাহা হইলে, আমাদের বড় অসুবিধা হইত। এ সময়ে বিশেষ সত্বরতার সহিত যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। যেহেতু ৪৫ মাইল অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হওয়াতে আমার অধিষ্ঠিত অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল দয়ার্দ্রহৃদয় বন্ধু আমাদেব যথোচিত আতিথ্য সৎকার করে। পরদিন আমরা উহা অপেক্ষা বহুলোকসমাকীর্ণ বহুবিস্তৃত আর একটি পল্লীতে উপস্থিত হই। এই স্থান হইতে আমি অজয়গড়ের রাণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র পাঠাই। এই পত্র পঁহুছামাত্র আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। আমরা ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে অজয়গড়ে উপস্থিত হই। পল্লী হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক সমস্ত পথ আমাদের রক্ষক হইয়া আইসে। অজয়গড়ে আমবা কয়েক দিন অবস্থিতি করি, যেহেতু আমাদের একজন সঙ্গী পথশ্রান্তিতে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার দাঁড়াইবার সামর্থ্য ছিল না। আমরা এই খানে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রান্তি বিনোদন করি। আমাদের বাহনগণও আমাদের সহিত সুস্থ ও সবল হয়। অজয়গড় হইতে আমরা নাগোদে যাত্রা করি। পরহিতৈষিণী রাণী আমাদিগকে লইয়া যাওয়ার জন্য কয়েকটি হাতী দেন।” বলা বাহুল্য যে উপস্থিত সঙ্কট কালে ভারতীয়দিগের এই রূপ সাহায্য না পাইলে পলাতক ইউরোপীয়দিগের প্রাণবিয়োগ হইত। দুর্গম পথ অতিবাহনে, দুর্দ্দান্ত লোকদিগেব তাড়নে বা দুরাশয় অস্ত্রধারীদিগের আক্রমণে তাঁহারা যাতনার একশেষ ভুগিয়া হয় ত শেষে মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেন।

নওগাঁও হইতে আর এক দল পলাতক আর এক পথে যাত্রা করেন। ইঁহারাও ভারতবাসীর করুণায়, সদাশয়তায় ও হিতৈষিতায় অভীষ্ট স্থানে উপনীত হন। ইঁহাদের পলায়ন কাহিনীতেও ভারতবাসীব পরোপকারের চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইঁহাদের এক জন এই ভাবে আপনাদেব দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। “আমি যখন সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছিলাম, তখন একটি লোক আমার নিকট উপস্থিত হয়। এই লোক আপনাকে রাজার দূত বলিয়া

পরিচয় দেয়। রাজা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই শুভ সংবাদ পাইয়া আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হই। লুগাসির রাজা আমাকে যথোচিত আদরের সহিত গ্রহণ করেন, এবং নওগাঁওর সিপাহিযুদ্ধের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। তাঁহার তদানীন্তন মুখভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছিল যে তিনি ইউরোপীয় আফিসরদিগের নিরাপদ হওয়ার সংবাদের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। রাজা আমাকে কোন আফিসর নিহত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমি সন্ত্রস্ত ভাবে পলায়ন করাতে নওগাঁর সিপাহিযুদ্ধের বিবরণ কিছুই জানিতে পারি নাই; সুতরাং রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ হই। রাজা আমার আহার্য্য সামগ্রী আনিয়া দিতে অনুচরদিগকে আদেশ দেন, এবং আমাকে সেই রাত্রিতে পল্লীর একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাখিতে কহেন। কেহ আমার কোনও অনিষ্টসাধন করিতে না পারে এই জন্যই আমার বাসের নিমিত্ত ঐ গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন যে, ছত্রপুরে মেজর কার্ক নামক একজন সৈনিক পুরুষের নিকটে তিনি পত্র লিখিবেন। এতদ্ব্যতীত উত্তেজিত সিপাহিরা নওগাঁও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে কি না ইহা জানিবার জন্য এক জন গুপ্তচর পাঠাইতেও তাঁহার ইচ্ছা আছে।

তৃতীয় দিন রাত্রিতে আমরা কালিঞ্জরের অভিমুখে যাত্রা করি। প্রথমে জোবাই নামক পল্লীতে উপনীত হই। এই থানে হামিরপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কার্ন্ সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইনি আমাদের জন্য ১০০০৲ টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এই টাকা চিরকারীর রাজা তাঁহাকে ধার দেন।

পথে আমাদের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, কুত্রাই নামক পল্লীর অধিবাসিগণ আমাদিগকে উক্ত পল্লী হইতে তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কাহার দ্বারায় এই সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, আমাদের বিপক্ষগণ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য এই সংবাদ প্রচার করে। উত্তেজিত সিপাহিরা এখন আপনাদের কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের দ্বারা এই জনরব প্রচারিত

হওয়া বিচিত্র নয়। যাহা হউক, পরিশেষে উক্ত সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমরা ১২ কি ১৩ দিন ঐ পল্লীতে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করি। পল্লীবাসিগণ আমাদের আহারীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য পর্য্যাপ্ত না হওয়াতে শেষে আমরাই আমাদের খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে থাকি।

কুব্রাই হইতে আমরা বাঁদা যাইবার জন্য মিতাউন নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করি। অপরাহ্ন ৬টার সময় আমরা ঐ পল্লীতে উপনীত হই। পল্লীতে প্রবেশ সময়ে অধিবাসিগণ যথোচিত দয়া ও সৌজন্যের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করে, এবং তাহারা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পল্লীমধ্যে লইয়া যায়। এই খানে আহারের জন্য দ্রব্যাদি ও শুইবার জন্য খাটিয়া দিয়া আমাদের তৃপ্তি সাধন করে। এই স্থানে ৪।৫ দিন থাকিবার জন্য আমরা স্থানীয় জমিদারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি। জমিদার যথোচিত ভদ্রতার সহিত কহেন যে,—"আপনাদের যত দিন ইচ্ছা হয় ততদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারেন।" স্থানীয় ভূস্বামিগণ কেবল এইরূপ সৌজন্য দেখাইয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা আমাদের প্রত্যেককে এক এক প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র ও এক এক খানি কম্বল দেন। বেণিয়াগণ (শস্যব্যবসায়ী) যদিও কঠোর-হৃদয় বলিয়া পরিচিত, তথাপি তাহারাও আমাদের জন্য ময়দা যোগাইতে বিমুখ হয় নাই। কেহ কেহ আমাদের তৃপ্তির জন্য চুরুট আনিয়া দেয়। এই স্থানে আমরা শুনিতে পাইলাম যে বাঁদার ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছেন, এজন্য আমরা উক্ত স্থানে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। যাহাতে আমরা নিরাপদে নাগোদে উপনীত হইইতে পারি, তদ্বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আমি বুন্দেলখণ্ডের সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ইলিস্ সাহেবের নিকট এক খানি পত্র লিখি। স্থানীয় ভূস্বামী পত্র-বাহককে একটি টাকা দিয়া ঐ পত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দেন। পত্র-বাহক দশ দিনে প্রত্যাগত হয়। সে ইলিস্ সাহেব ও কাপ্তেন স্কট্ নামক একজন সৈনিক পুরুষের পত্র সঙ্গে করিয়া আনে। প্রায় এক মাস কাল অবস্থিতির পর আমরা ৯ই আগষ্ট মিতাউন হইতে যাত্রা করি। ৫০ জন

লোক আমাদের রক্ষক হইয়া নগর পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হয়। মিত্তাউন হইতে পনর মাইল দূরে গৌরীচর নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানের জায়গীরদার আমাদিগকে অতি শীলতা ও আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করেন। আমরা এই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। গৌরীচরে আমাদিগকে ১৭ দিন থাকিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে উক্ত জায়গীরদার আমাদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দরজি আনিতে বাঁদায় লোক পাঠান। কিন্তু বাঁদায় নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে এই লোক কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারে নাই।

প্রেরিত লোক বাঁদা হইতে কেবল কয়েক জোড়া চর্ম্মপাদুকা আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বড় হওয়াতে আমরা উহা ফেরত দিতে বাধ্য হই। যাহা হউক, স্থানীয় ভূস্বামী আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দ্রব্য দিতে তাঁহার লোকদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটে যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ২৮শে আগষ্ট স্থান পরিত্যাগ করি। ভূস্বামী আমাদের যাত্রার সময় সঙ্গিনী মহিলাদের জন্য তাঁহার পাল্কী এবং আমাদের জন্য তাঁহার হস্তী সজ্জিত করিয়া দেন।”

উপস্থিত সময়ে সকল সিপাহিই যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া ইংরেজদিগের বিনাশ-সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় নাই। সময়ের উত্তেজনায়, লোকের কুমন্ত্রণায়, ইংরেজের কুটিল রাজনীতির তাড়নায় এ সময়ে অনেকে অধীর হইয়াছিল; অধীর ভাবে অনেকে ইউরোপীয়দিগের শোণিতে ভারতের অনেক স্থান রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র সিপাহিসৈন্য ইঙ্গরেজদিগের বিপক্ষতা করে নাই। কেহ কেহ আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয় নিপীড়িত ও নিদারুণ শোচনীয়দশাগ্রস্ত ইঙ্গরেজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। একজন আফিসর এইরূপ একটি দয়াপর সিপাহির বিবরণ এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।—“কতকগুলি সিপাহি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে থাকে। আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি ‘কি!—তোমরা কি সকলেই আমার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ!’ এই কথা শুনিবামাত্র কতকগুলি আমার অধিষ্ঠিত অশ্বের চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায়। আমি তাড়াতাড়ি এক জন সেনা নায়কের গৃহে লুক্কায়িত হই।

তিন জন রসলদার এবং প্রায় ৪০ জন অশ্বারোহী সিপাহি আমাকে রক্ষা করিতে কিম্বা আমার পতনের সহিত তাহাদের দেহপাত করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়। দুই জন সৈনিক পুরুষ তাঁহাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তান লইয়া পদ-ব্রজে পলাইতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া আইসি। রসলদার ও সিপাহিগণ আমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিলেও আমি সহসা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যেহেতু ঐ মহিলা ও সন্তান গণের রক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না।

তৃতীয় দিন আমি ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করি। অশ্বারোহী সিপাহিগণ আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাইতে থাকে। স্থানীয় ভূস্বামীর একজন উকীলের যত্নে পূর্ব্বোক্ত সৈনিকপুরুষদ্বয়ের স্ত্রী ও সন্তানগণ রক্ষা পায়।

আমি আবু নামক স্থানে উপনীত হইলে, সেই স্থানের লোকে যথোচিত সদয় ভাবে আমার ব্যবহারের জন্য কাপড় তামাক ইত্যাদি আনিয়া দেয়।

যে রসলদার আমাকে এইরূপে রক্ষা করিয়াছিল তাহার নাম আব্বাস আলি। আমার বিশ্বাস যে তাহার জীবনের কোনও হানি হয় নাই। আমি মাড়বারের ইংরেজ সেনাপতি ও পলিটিক্যাল এজেণ্টকে এই সাহসী সৈনিক পুরুষের জীবনরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি; যেহেতু এই ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়াছিল এবং বিপক্ষদিগের প্রায় বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অনেকগুলি সাহসী অশ্বারোহী তাহার সহায় থাকাতে বিপক্ষগণ আপনাদের স্বার্থ নষ্ট না করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতে পারিবে না।”

ভারতীয় সৈনিক পুরুষের যত্নে আর একটি ইউরোপীয় সেনানায়কের জীবন এইরূপে রক্ষিত হয়। দুই জন হাবিলদার লেপ্টেন্যাণ্ট রেলি নামক একজন সৈনিক পুরুষের প্রাণরক্ষা করে। ইহারা বিবাহে যাইবার ডুলিতে করিয়া রেলিকে ভাগলপুরে আনে। এই ডুলি ভাড়া করা হইয়াছিল। লেপ্টেন্যাণ্ট রেলি পরিশ্রান্তি ও ক্ষুধায় এইরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে হামাগুড়ি দিতেও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। চারি দিকে গুলিবৃষ্টির মধ্যে তিনি হাবিলদারদ্বয়ের চেষ্টায় রক্ষা পান। এইরূপে জীবন রক্ষা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

গ্রিগর গ্র্যাণ্ট্ নামক আর একজন ইউরোপীয় দুই দিন অনাহারে ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি আর একটি পল্লীতে উপনীত হন। পল্লী-বাসিগণ তাঁহার আহারের জন্য দুগ্ধ ও মুড়কি আনিয়া উপস্থিত করে। ক্ষুধার্ত্ত ইউরোপীয় যথোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার খিদমদ্‌গার ঐ পল্লীতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গ্র্যাণ্ট সাহেব তাহাকে নিজের নিকটে আহ্বান করেন। খিদমদ্‌গার উপস্থিত হইলে একটি ডুলি প্রস্তুত হয়; কেন না গ্র্যাণ্ট্ সাহেবের পদতলে গভীর ক্ষত হওয়াতে তাঁহার চলিয়া যাইবার সামর্থ্য ছিল না। রাত্রিতে যে কাপড় ব্যবহার হয়, তিনি কেবল সেই কাপড়ে ছিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কাপড় বা পাদুকা ছিল না। তাঁহার ঘোটক ও হস্তী পরহস্তগত হইয়াছিল, তাঁহার বস্ত্রাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি খিদমদ্‌গারের সঙ্গে বস্ত্রাবৃত ডুলিতে যাইতে লাগিলেন। খিদমদ্‌গার ঐ ডুলিতে তাহার নিজের স্ত্রী আছে বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। পলাতক ইউরোপীয় এইরূপে শঙ্কিত হৃদয়ে বৃত্তাকার পথ অতিবাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে তিনি শুনিতে পাইলেন যে অন্যান্য সেনানিবাসের সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় আফিসরদিগকে হত্যা করিয়াছে। এই সংবাদে তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে সিপাহিদিগের হস্তগত হইলে স্বয়ংও ঐ রূপে নিহত হইবেন। কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় ও তাঁহার বিশ্বস্ত খিদমদ্‌গারের অসীম চেষ্টায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্র্যাণ্টের জীবন রক্ষা পাইল।

দেওঘরের সিপাহিসৈন্য যুদ্ধোন্মুখ হইলে, যে দুই জন হাবিলদার তাহাদের অধিনায়ক লেপ্টেন্যাণ্ট রেলিকে ভাগলপুরে আনিয়া রক্ষা করিয়া-ছিল, তাহাদের এক জনের নাম দরিয়া সিংহ ও অপরের নাম ঠাকুর দোবে। ইহারা ৩২ গণিত পদাতিক সৈন্যদলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ভাগল-পুরের অধিবাসিগণ চাঁদা করিয়া ৮ শত টাকা সংগ্রহ করে। ঐ টাকা উক্ত বিশ্বস্ত হাবিলদার দ্বয়ের পারিতোষিক দেওয়া হয়।

ফইজাবাদের ডেপুটি কমিসনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন নিকটবর্ত্তী

সেনানিবাসে সিপাহিরা যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আপনার স্ত্রীকে গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে নদীকূলাভিমুখে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। একজন বিশ্বস্ত চাপরাশি তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। ডেপুটি কমিশনর এই সংবাদ পাঠাইয়া স্বয়ং সেনানিবাসে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সৈনিক কর্ম্মচারিগণের সাহায্যার্থে যদি কোন কার্য্য করিতে হয়, সেই জন্যই ডেপুটি কমিসনর কাছারি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ দিকে ডেপুটি কমিশনরের বনিতা বিশ্বস্ত চাপরাসির সঙ্গে পাল্কীতে নদীকূলের দিকে যাইতে লাগিলেন। রাত্রি সমাগমে তাঁহাকে একটি পল্লীতে আশ্রয় লইতে হইল। বাহকেরা পাল্কী নদীর ধারে রাখিয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইল। সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। উক্ত পল্লীবাসিনী একটি দরিদ্র মহিলা আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাকে একটি অব্যবহার্য্য তন্দুরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। ডেপুটি কমিশনরের স্ত্রী ভীতিবিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি সেইখানে রহিলেন। সিপাহিরা চারিদিকে পলাতক ইংরেজদিগের অন্বেষণ করিতেছিল; লুক্কায়িত পলায়িতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়াও সকলকে ভয় দেখাইতেছিল। যখন উক্ত ইংরেজমহিলা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামীন পুরুষেরা গোধন সঙ্গে লইয়া কৃষিক্ষেত্রে গিয়াছিল, সুতরাং এ বিষয় তাহাদের গোচর হয় নাই; কিন্তু গ্রামের মহিলারা প্রায় সকলেই ইহা জানিত। সিপাহিরা ভয় দেখাইলেও তাহারা ঐ ইংরেজকুলকামিনীর কথা প্রকাশ করিল না। দয়া ও সাধুতার সম্মান তাহাদের নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলেও তাহারা হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইল না। সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল মধ্যে দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে বিদেশিনী সেই তন্দুরের অভ্যন্তরে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইল, ভীষণ কলরব অনন্ত আকাশে মিলিয়া গেল, উত্তেজিত সিপাহিরা কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে প্রস্থান

আইল। ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত চাপরাসি স্থানীয় ভূম্যধিকারী মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইয়া নৌকা প্রার্থনা করিল। মানসিংহ বিপন্নদিগের উদ্ধারার্থ চাপরাসির প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের স্ত্রী এবং অপর কয়েকটি ইংরেজ কুলকামিনী বালক বালিকার সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে কয়েকটি বিশ্বস্ত সিপাহি ও চাপরাসি বসিয়া রহিল এবং এখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। পথিমধ্যে ইহাদের সহিত কতকগুলি উত্তেজিত সিপাহির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে যে ইংরেজ কুলকামিনীগণ রহিয়াছে ইহা কেহই ঐ সিপাহিদিগের নিকটে প্রকাশ করিল না। সন্ধ্যা সমাগমে নৌকা নিরাপদে তীরে আসিয়া লাগিল। এই সময় ২।৩ জন চাপরাসি দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গেল। এই পল্লীর মহিলারাও বিপন্নদিগের যথোচিত যত্ন করিতে ত্রুটি করিল না। একটী দরিদ্রা মহিলা নৌকাশ্রিত শিশু সন্তানদিগকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে প্রবেশ করিল এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। শিশুসন্তানগুলি ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছিল। যাহারা এক সময়ে সর্ব্ব প্রকার সুখসৌভাগ্যে লালিত হইত, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট হইতে বিমুক্ত থাকিয়া নিরন্তর আমোদে কালাতিপাত করিত তাহারা এখন দুগ্ধের অভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনাদের দুঃসহ যাতনা প্রকাশ করিতেছিল। ধাত্রীগণ ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা আপনাদের স্তন্য দিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুসন্তানদিগকে সন্তৃপ্ত করিল। এই প্রকার সাহায্য দানে যে আপনাদের জীবনহানির সম্ভাবনা আছে ইহা তাহারা জানিত, তথাপি তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইল না; আশঙ্কা বলবতী হইয়া তাহাদিগকে এই মহত্তর কার্য্যসাধনে বাধা দিল না। তাহারা অসঙ্কুচিত ভাবে, নির্ভীকহৃদয়ে, বিপন্নের নিস্তার করিয়া জগতের সমক্ষে মহান্ ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিল। পলায়িত ইংরেজ কুলকামিনীগণ ইহাদের সহিত এক দেশে বাস করিতেন না, ইহাদের সহিত এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন না, ইহাদের সহিত এক প্রণালীতে—এক দেবতার আরাধনা করিতেন না এবং ইহাদের সহিত এক

জাতীয় বলিয়াও পরিচিত হইতেন না। এরূপ ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের হইয়াও ইঁহারা দরিদ্রা মহিলাদিগের অসাধারণ দয়ায় ঘোরতর সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। ভারতের পর্ণকুটীরবাসিনী এ পবিত্র স্নেহময়ীর নিঃস্বার্থ ভাবের সহিত অন্য কোন্ কার্য্যের তুলনা সম্ভবে না।

ইংরেজমহিলাগণ এইরূপ অসাধারণ পরোপকারগুণে শিশু সন্তানদিগের সহিত অক্ষত শরীরে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটী কমিশনর ও তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা বনিতা এই মহৎ উপকারের বিষয় বিস্মৃত হন নাই। যাহারা আপনাদের জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও অসময়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল; আশ্রয় দিয়া, আহার্য্য দিয়া ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাহারা তাঁহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর সময়ে নিরাপদে রাখিয়াছিল, শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

শান্তি।

নবম পরিচ্ছেদ।

বড় ভয়ানক কাণ্ড! শশী ভট্টাচার্য্য রাত্রে কাটা পড়িয়াছেন! প্রাতে তাঁহার কুটীরের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। পুলিসের ইনিস্পেক্টর, হেড় কনষ্টবল ও কনষ্টবল গস্ গস্ করিতেছে। কুটীর প্রাঙ্গনের অদূরে, একটা বনের অন্তরালে, লাস পড়িয়া আছে। লাস একখানি কাপড় দিয়া ঢাকা। ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া, যেখানে লাস পড়িয়া আছে সে পর্য্যন্ত, রক্তের ধারা রহিয়াছে। লাসের দুই দিকে দুই জন কনষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে।

দূরে এক স্থানে, পাঁচ জন কনষ্টবলবেষ্টিত হইয়া, কালী ও রামলাল

বসিয়া আছে। তাহাদের উভয়েরই হাতে হাতকড়ি। কালীর ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং তাহার ভাব নিতান্ত ভীতিশূন্য। রামলাল নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন। বহু ক্রন্দন হেতু তাহার চক্ষু লাল। সে অধোমুখ। উভয়েরই পরিধান বস্ত্র রক্তাক্ত। রামলালের বস্ত্রাপেক্ষা কালীর বস্ত্র অধিক রক্তাক্ত।

অদূরে, একটী বৃক্ষতলে, ইনিস্পেক্টর বাবু, এক জন প্রতিবাসিপ্রদত্ত, একটী মোড়ায় বসিয়া, হাসিতে হাসিতে, হুঁকায় পাতার নল লাগাইয়া, তামাকু খাইতেছেন, তাঁহার সম্মুখে রক্তরঞ্জিত এক দা। তাঁহার নিকটে কয়েকজন কনষ্টবল দণ্ডায়মান।

সকল স্থানেই লোক। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ—লোকের আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা ভিড়ের বড় নিকটে যাইতে পারিতেছে না; দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ও শুনিতেছে। তাহাদের দেখিলে পোড়ারমুখো পুরুষগুলার মন ঠিক থাকিবে না বলিয়া যে সকল যুবতী ও অর্দ্ধবয়সী নারীর বিশ্বাস আছে, তাহারা গাছের আড়ালে ও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া, নিতান্ত ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছে। প্রাচীনারা লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাই আবার দশগুণ বাড়াইয়া, হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে,নবীনাদের নিকটে আসিয়া গল্প করিতেছে। ছেলেরা ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে; তাহাদের মা, বা পিসী, বা মাসী তাড়া দিয়া যাইতে বারণ করিতেছে। দুই একটা দুষ্ট ছেলে তাড়া ও চখরাঙ্গানীতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, লোকের পায়ের ফাক দিয়া, গুড়ি গুড়ি আসিয়া, যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছে। দুই একজন বৃদ্ধ আপনার যুবক পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বা ভাগিনেয়কে স্বাক্ষী দিতে হইবে ভয় দেখাইয়া গোলের নিকটে যাইতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু যুবকেরা সে উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিতেছে না।

ভট্টাচার্য্যের কুটীরের দ্বার হইতে উকি দিয়া যাহারা ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেছে তাহারা সেখানকার রক্তগঙ্গা কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইতেছে। তক্তাপোষের উপর হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া ঘর ভাসিয়া গিয়াছে। সুতরাং তক্তাপোষের উপরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন নিদ্রিত ছিলেন,

তখনই যে তাঁহাকে কাটিয়াছে তাহার আর ভুল নাই। তাহার পর সেই রক্তের উপর পায়ের দাগ এবং মৃত ব্যক্তিকে হেঁচড়াইয়া আনার দাগ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

যেখানে লাস সেখানে লোকে কেবল হায় হায় করিতেছে। দুই এক জনের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। দুই এক জন সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। শশী ভট্টাচার্য্য নিতান্ত নিরীহ ও শান্ত ব্যক্তি। গ্রামের যাবৎ লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসে ও আত্মীয় জ্ঞান করে। তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত। কিরূপে কাটিয়াছে, কোথায় কিরূপে আঘাত করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য অনেকে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। লাস কাপড ঢাকা থাকায় তাহাদের সে ইচ্ছা সফল হওয়ার কোনই সুযোগ হইতেছে না। তাহারা কৌতূহল নিবৃত্তির অন্য উপায় না দেখিয়া কখন বা কনষ্টবলদের পীড়াপীড়ি করিতেছে, কখন তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতেছে। কনষ্টবল মহাশয়রা কৃপা করিয়া দুই একটা কথা বলিতেছেন। যাহা বলিতেছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে, লাসের সর্ব্বাঙ্গে পঁচিশ ত্রিশ স্থানে সাংঘাতিক আঘাত আছে; তাহার মধ্যে ঠিক গলার নিকট হইতে বুকের উপর পর্য্যন্ত যে এক প্রকাণ্ড আঘাত তাহা দেখিতে যেমন ভয়ানক তেমনই গুরুতর।

যেখানে কালী ও রামলাল প্রহরীবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে সেখানে অনেক লোক। তাহাদের দেখিয়া অনেকেই নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানা কথা বলিতেছে। একজন ইয়ার যুবা বলিয়া ফেলিল, "ফাঁসির কাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে এখন ইয়ারকির চূড়ান্ত হইবে বাবা।" কালী একথায় একটুও বিচলিত হইল না। কিন্তু রামলাল কাঁদিয়া ফেলিল। আর এক উদ্ধত ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিল, "ডালকুত্তা দিয়া ইহাদের খাওয়ায় না?" এবার কালী কুপিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক বৃদ্ধা কোন প্রকারে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কালীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কালামুখী, ধিক্ জীবনী! তোর গলায় দড়ি।" কালী এবারেও ভ্রূকুটী করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর এক প্রবীণ লোক বৃদ্ধার কথার উত্তরে বলিল,

"সে কথা আর তোমার বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। আর বড় জোর মাস খানেকের মধ্যে গলায় দড়িই হইবে।"

যেখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইনিস্পেক্টর বাবু বসিয়া আছেন সেখানে তাঁহার শ্রীবদনারবিন্দবিনির্গত বাক্যসুধালালসায় অনেকে নিতান্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তিনি কিন্তু বাক্যবিতরণে নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তদারকসংক্রান্ত লেখাপড়া ও অন্যান্য সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি লাস চালান দিবার জন্য একখানি গরুর গাড়ি আনিতে কনষ্টবল পাঠাইয়া অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি বড় লোক জ্ঞানে লোকে তাঁহাকে সাহস করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। দুই এক ভদ্রগোছের প্রবীণ লোক তাঁহাকে বিনীতভাবে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি দিন দুনিয়ার মালিক ভাবে, প্রশ্নের সিকি খানা, কদাচিৎ আধ খানা, উত্তর দিয়া কাজ সারিতেছেন।

কিন্তু কিরূপে এ কাণ্ড পুলিসের গোচর হইল তাহা এখনও বলা হয় নাই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর অনতিদূরে সদানন্দ দাস নামে এক কৈবর্ত্তের কুটীর। সদানন্দ কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তর যাইবে বলিয়া সেদিন ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। রাত্রি যখন একটা তখন সদানন্দ হাত মুখ ধুইবার জন্য ঘটী হাতে করিয়া বাহিরে আইসে। বাহির হইয়াই সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘর হইতে ধপাস্ করিয়া এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট 'মাগো' শব্দ তাহার কাণে যায়। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ছট্‌ফট্, গোঁ গোঁ, ধপাস্ ধপাস্, দুম দাম শব্দ সে শুনিতে পায়। ভট্টাচার্য্য-পত্নীর স্বভাব চরিত্রের কথা এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনান্তরের কথা পাড়া প্রতিবাসী সকলেই জানিত। ভট্টাচার্য্যের ঘরের মধ্যে তখন আলো জ্বলিতেছিল। সদানন্দ ঘরের আরও নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে দুইজন লোক ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। গত বর্ষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরের এক দিকের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। সেদিকে এখনও নূতন দেয়াল দেওয়া ঘটে নাই, দরমার বেড়া দেওয়া আছে মাত্র। সদানন্দ অতি সাবধানে, সেই বেড়ার নিকটে আসিয়া, একটা ছিদ্র দিয়া ভিতরকার ব্যাপার দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কতদূর সে দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার পেটের পীলে চমকাইয়া গেল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এবং আপনার প্রয়োজন পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ঘটী হাতে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যাহা যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে সমস্তই সে সেখানে অকপটে ব্যক্ত করিল। তখনই পুলিসের লোকেরা তাহার সঙ্গে আসিল। রাত্রি তখন প্রায় ৪টা। এই পর্য্যন্ত কথা সদানন্দ দাসের জবানবন্দীতে ব্যক্ত হইয়া ইনিস্পেক্টর বাবুর কলমের গুণে কাগজজাত হইয়াছে। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল তাহা পুলিস স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

পুলিস আসিয়া দেখিল কালী ও রামলাল শশী ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ টানাটানি করিয়া বনের দিকে লইয়া যাইতেছে। সে সময়টা জ্যোৎস্না থাকায় তাহাদের দেখার বিশেষ অসুবিধা হইল না। তাহারা নিকটস্থ হইয়া কালী ও রামলালকে ধরিয়া ফেলিল। রামলাল প্রথমে পলাইবার, পরে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তখন অকপটে সমস্ত অপরাধ, কাঁদিতে কাঁদিতে, স্বীকার করিল। কালীর বিশেষ উত্তেজনায় এবং আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে ঐ কাজে লিপ্ত হইয়াছিল, কালীর সহায়তা ভিন্ন সে আর কিছুই করে নাই; এবং ভট্টাচার্য্যের শরীরে সে স্বহস্তে একটীও অস্ত্রাঘাত করে নাই, একথা সে বিশেষ করিয়া বলিল। কালীও অকাতরে সমস্ত পাপ ব্যক্ত করিল। ভট্টাচার্য্য তাহার সুখের পথে কণ্টক সুতরাং তাঁহাকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক মনে করিয়া সে, স্বহস্তে দা দিয়া বারম্বার আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে, একথা সে নির্ভীকভাবে স্বীকার করিল। রামলাল স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে নাই। কালীর বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া সে সামান্য সাহায্য করিয়াছে মাত্র এবং সে না থাকিলে কালী একাই সব করিত এমন কথা পর্য্যন্ত কালী বলিল।

বেলা যখন ১০টা তখন গাড়ি আসিল। ইনিস্পেক্টর বাবু গাড়িতে লাস উঠাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়িবদ্ধ কালী ও রামলালকে চালান দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। ক্রমে ক্রমে সেখানকার লোকের ভিড়

করিতে লাগিল এবং কেহ বা কালীকে গালি দিতে দিতে, কেহ বা শশী ভট্টাচার্য্যের জন্ত আক্ষেপ করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নিতান্ত দার্শনিক ভাবে মানবচরিত্রের এতাদৃশ দুর্ব্বৃত্ততার কথা আলোচনা করিতে করিতে এবং কেহ কেহ বা কালী ও রামলালের কাহার কিরূপ সাজা হইবে তাহার বিচার করিতে করিতে বাটী ফিরিল। কিন্তু কয়েকদিন প্রতিবাসী নরনারীগণ নিরন্তর এই কাণ্ডের বিবিধ ভঙ্গীতে আলোচনা করিতে ভুলিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে শশী ভট্টাচার্য্য হত হন তাহার মাসাধিক কাল পরে একদিন সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে রাধানাথ রায়ের বহ্বায়ত ভবনের অন্তঃপুরমধ্যস্থ এক সুবৃহৎ ছাতের উপর রমাপতি পরিভ্রমণ করিতেছেন। রমাপতি একাকী নহেন। তাঁহার বামকরের মধ্যমাঙ্গুলি ধারণ করিয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। স্তবকে স্তবকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি বালিকার কপালে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ও আস্যে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বালিকার বয়স চারি বৎসর। তাহার আকর্ণ বিস্তৃত, স্থূল সূক্ষ্ম ভ্রূযুগলাচ্ছাদিত, সমুজ্জ্বল লোচন, তাহার দেহের অপূর্ব্ব গৌরকান্তি ও লাবণ্যজ্যোতিঃ, তাহার কোমল রক্তাভ বিম্বোষ্ঠের হসিত ভাব, এবং তাহার অস্ফুট ও ভগ্ন, মৃদু ও মধুর, আনন্দ ও হাস্যময় বাক্যাবলী যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে সে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্ত ব্যাকুল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। এই বালিকার নাম মাধুরী। পাঁচ বৎসর হইল রমাপতি ও সুরবালা বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন, বিধাতা তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয় বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে এই কন্যা সন্তান, এবং তাহার দুই বৎসর পরে একটী সুকুমার পুত্র সন্তান প্রদান করিয়া

তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতে যে যে পদার্থ মানবের সুখ-সম্বিধানে সমর্থ তাহার সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত। ধনই, অনেক স্থলে, ভোগবিলাসানুরত বা পরোপকারপ্রবণহৃদয় মানবের আশা নিবৃত্তির অনন্য সাধন এবং তৃপ্তির সর্ব্বপ্রধান উপাদান। সে ধন, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রমাণে, তাঁহাদের করায়ত্ত। দাম্পত্য প্রণয়, সৎস্বভাব সম্পন্ন যুবকযুবতীর পক্ষে, সর্ব্বসুখবিধায়ক সামগ্রী। ভগবৎকৃপায় এই সৌভাগ্যবান্ যুগল তাদৃশ প্রণয়ের আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযোগী। এই সকল দুর্লভ সুখও শিশুকণ্ঠোত্থিত অস্ফুট আধ আধ স্বরের সহিত বিজড়িত না থাকিলে মধ্যমণিহীনা রত্নহারের ন্যায়, সতীত্ব সম্পত্তিশূন্যা সুন্দরীর ন্যায়, কপর্দ্দকমাত্রবিহীন দাতার ন্যায় এবং সুরভি-কুসুমপরিশূন্য কণ্টকাকীর্ণ উদ্যানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া অনেকে বোধ করেন। কিন্তু অনুকূল বিধাতৃ-অনুকম্পায় তাঁহাদের সে অভাবও নাই। সুতরাং তাঁহারা সৌভাগ্যশালীগণের শীর্ষস্থানীয়।

কিন্তু জগতে অব্যাহত সুখ সম্ভোগ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। তাঁহারা বড় দাগা পাইয়াছেন—বড় ঝড় তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী উভয়েই ইহলোক হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনতিকাল পরে রাধানাথ রায় লীলা সম্বরণ করেন। সেই দারুণ দুর্ঘটনার তিনমাস পরে, সেই দুর্দ্দমনীয় শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবার পূর্ব্বেই, সুরবালার জননী পতিপরিগৃহীত পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে দুই সুমহান্ তরুর সুশীতল ছায়াতলে নিরুদ্বেগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নাই। যে দুই জীবন সংসারের কঠোর সংঘর্ষণ হইতে অন্তরিত থাকিয়া, আনন্দ ও সৌভাগ্যসম্ভোগমাত্র লক্ষ্য করিয়া, সুখে অতিবাহিত হইতেছিল তাহাদের অতঃপর সংসারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। যে পর্ব্বতের অন্তরালে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের সুখ ও সন্তোষ, আনন্দ ও প্রীতি ভোগ ও বিলাস বিধায়ক ব্যবস্থা করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহারা আর নাই। রাধানাথ রায়, ভবরঙ্গভূমি হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, এক উইল পত্র-

দ্বারা স্বীয় বিপুল বিভবাদির বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উইল অনুসারে তাঁহার জামাতা রমাপতি সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিত্ব ও সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

রমাপতি মাধুরীর সঙ্গে বেড়াইতেছেন। মাধুরী তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে বলিলেই হয়; কারণ সে কখন জোরে জোরে চলিয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কখন বা পশ্চাতের বা পার্শ্বের পদার্থ বিশেষে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া পা ফেলিতে ভুলিয়া যাইতেছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি বাবুও থামিতেছেন। আর যে তাহার গজর গজর বকুনি তাহার কথা আর কি বলিব। বেদ কোরাণের বহির্ভূত সে অনেক গল্প করিতেছে। ভাষার উচ্চারণবিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পদস্থাপনের রীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া এবং প্রসঙ্গের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রসঙ্গান্তর অবতারিত করিয়া মাধুরী ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেছে। কিন্তু তাহার সেই অসম্বদ্ধ ও অযথাব্যক্ত বাক্যাবলী তাহার পিতার কর্ণে অজস্র ধারায় মধুবর্ষণ করিতেছে। স্বভাবসঞ্জাত অপত্যস্নেহ, তনয়ার তাদৃশ অপরিস্ফুট বচনবিন্যাস মধুময় করিবার প্রধানতম হেতু হইলেও, মাধুরীর সুস্বরবিজড়িত ভঙ্গ ভাষা নিতান্ত নির্লিপ্ত শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরকেও মোহিত করিতে সমর্থ।

পিতা ও পুত্রী যখন এইরূপে নিযুক্ত সেই সময়ে সুন্দরীশিরোমণিস্বরূপা সুরবালা সেইস্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার অঙ্কে এক নির্ম্মলকান্তি, নিরুপম নয়নানন্দ নন্দন। সেই ভুবনমোহন পুত্র দূর হইতে রমাপতি ও মাধুরীকে দেখিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, মধুস্বরে, মধুময় হাস্যের সহিত, "ধূ—ধূ—বা—বা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশুর নিতান্ত নবীন বাগ্‌যন্ত্র মাধুরীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। সে সেই জন্য স্বকৃত অত্যদ্ভুত ব্যাকরণের সহায়তায়, সেই কঠোর শব্দের ভূবিভাগ 'ইৎ' করিয়া কেবল ধূ টুকু বজায় রাখিয়াছিল। শিশুর সেই অমৃতময় বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র রমাপতি ও মাধুরী ব্যস্ততা সহ সেই দিকে ফিরিলেন। রমাপতি দেখিলেন, অপূর্ব্ব দর্শন! সেই রবিকরপরিশূন্য, স্নিগ্ধ ছায়ারাশি পরিবৃত, সমুচ্চসৌধশিরে; সেই নীড়গামী, নানাদিগ্‌বিহারী

বহুভাষী, বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গমবেষ্টিত দৃশ্যমধ্যে; সেই প্রীতিপ্রদ, প্রবহমান, সুস্নিগ্ধ, সুশীতল, বসন্তানিল সাগরে, রমাপতি দেখিলেন, সুরবালা, তাঁহার সুরনায়ক তুল্য সুকুমার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, দাঁড়াইয়া! মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলে শিশুর কেশের গুচ্ছ নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে এবং সুরবালার প্রলম্বিত অঞ্চল কেতনবৎ উড্ডীয়মান হইতেছে। বালিকা সুরবালা এখন যুবতী হইয়াছেন। যৌবনসমাগমে এখন সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্য পূর্ণোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়াছে। রমাপতি অতৃপ্ত নয়নে সেই লাবণ্যময়ীর স্বর্ণকান্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মাধুরী, "বাবা! ডেক ডেক, ঐ মা" বলিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। তখন রাজরাজমোহিনী সুরবালা মাধুরীর হস্তধারণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। রমাপতিও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মধ্যপথে সুরবালার সমীপাগত হইলেন এবং বলিলেন,—

"এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা? আঠারো মাসে বুঝি তোমার বৎসর?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তা আমি জানি। এতক্ষণে তোমার হুকুম তামিল করিতে না পাবায়-অবশ্যই দাসীর অপরাধ হইয়াছে। আমি আসিতেছি এমন সময়ে পুঁটের মা ছেলের জন্য জ্বরের ঔষধ চাহিতে আসিল। তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে দেরি হইল। তা যাই হউক, দাসী গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া মান ভিক্ষা করিতেছে। যদি নিতান্তই হুজুর তাহাকে ক্ষমা না করেন তাহা হইলে দাসী শেষে এমন কল খাটাইবে যে হুজুরের তখন নাকালের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু রমাপতি তখন উত্তর দিবেন কি? সেই রূপসীর মধুর বাক্য, মধুর ভাব, এবং মধুর ভাষা তাঁহাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। কথায় কি ছাই তখন প্রাণের কথা বাহির হয়? কটা কথা লইয়াই বা ভাষা, কটা ভাবই বা তাহাতে ব্যক্ত হয়। রমাপতি সে কথার উত্তর দিবার কোন প্রয়াস না করিয়া খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত পাতিলেন। খোকা সানন্দে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার কোলে পড়িল। রমাপতি বারম্বার তাহার বদন চুম্বন করিলেন। তখনই কয়েক জন ঝি, তাঁহাদের কোন

আদেশ আছে কি না জানিবার নিমিত্ত, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রমাপতি মাধুরী ও খোকাকে লইয়া ছাতে ছাতে বেড়াইতে আদেশ করিলেন। তখন সুরবালা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"মানিনীর মান কি ভাঙ্গিয়াছে? না শেষে মানের দায়ে নিজে নাকে কাঁদিতে সাধ আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"সাধ যাহা আছে তাহা দেখিতে পাইবে এখনই। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা' জানতো? দোষ করিলে নিজে, নাকে কাঁদাইতে চাও আমাকে! তোমার মত লোক বিচারক হইলে দেশে সুবিচারের স্রোত বহিয়া যাইবে।"

সুরবালা রমাপতির হাত ধরিয়া অন্য এক ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি বিচারক হইলে এই কপট পুরুষগুলাকে বিলক্ষণ জব্দ করিয়া তবে ছাড়ি।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সকলের প্রতিই কি তাহা হইলে ধর্ম্মাবতার সমান বিচার করিবেন? কেহই কি আপনার ন্যায় দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না?"

সুরবালা মুখের হাসি অঞ্চলে চাপিয়া বলিলেন,—

"কেহ না। যাহাদের মধ্যে সকলেই কপট তাহাদের আবার ছাড়াছাড়ি কি? সকলেরই সাজা।"

রমাপতি বলিলেন,—

"পুরুষ যে অত্যন্ত কপট তাহার আর সন্দেহ কি? তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য কখন কি কালীকে এত ভাল বাসিত?"

সুরবালা কালীর নামোচ্চারিত হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তোমরা—তোমরা দেবতা।—আমরা সামান্য মেয়ে মানুষ—আমরা তোমাদের মহিমা কি বুঝিব? তোমরা আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটকে পদে দলিত না করিয়া হৃদয়ে স্থান দেও, এ তোমাদের আশ্চর্য্য দেবত্ব। বলিলেন,—

"জানি না কোন্ স্বর্গে শশী ভট্টাচার্য্যের স্থান হইবে। স্বর্গ যদি থাকে এবং স্বর্গে যদি শ্রেণী থাকে তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইবেন। আর কালী? নরকেরও কি নরক নাই? সে কেন মানবদেহ পাইযাছিল? বিধাতঃ! তোমার রাজ্যে তাহার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছ?"

রমাপতি দেখিলেন, ক্রোধে ও হৃদযের যাতনায় সুন্দরীর বদন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। লোচনযুগল উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবন্ যে হস্ত হইতে কালীর ন্যায় পিশাচীর সৃষ্টি, এই দেবীও কি সেই হস্তেরই ফল? সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

কিন্তু মানবরাজ্যে কালীর ঘোর দুষ্কৃতির কি শাস্তি হইল তাহা আমি জানিতে পাই নাই। তাহার পাপ আত্মা আজিও কি সেই দেহে আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"বিচারে কালীর ফাঁসি ও রামলালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইয়াছে। বোধ হয আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কালীর ফাঁসি হইযা যাইবে।"

সুরবালা আবার চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"ফাঁসি হইবে। ফাঁসিই কি তাহার শাস্তি? ফাঁসি না হইলে কি চলে না? কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ কি? যাহা হইবার তাহাই হউক।"

অনেকক্ষণ আর কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর সুরবালা বলিলেন,—

"তোমার সহিত আমার এবার ভারি ঝগড়া হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"অপরাধ?"

সুরবালা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—

"মোকদ্দমার জন্য তুমি কলিকাতায় যাইবে বলিতেছ, সেখানে দশ পনর দিন দেরি হইবে তাহাও বলিতেছ। কিন্তু একবারও আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওযার কথাটা বলিতেছ না। বেশ, যাও তুমি, আমি ইহার এমন শোধ তুলিব যে তোমাকে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"কেন তোমাকে লইয়া যাইব? আমার কি আর কেহ নাই? মনে কর আমার সুকুমারীর সহিত দেখা হইবে।"

সুরবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"এমন দিন কি হইবে? ভগবান যেন তাহাই করেন।"

রমাপতি বলিলেন,—

"এমন দিন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই জান বলিয়া একথা বলিতেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা যাহাই মনে কর, সুকুমারী বাঁচিয়া আছেন। মনে কর যদিই কলিকাতায় গিয়া সুকুমারীকে পাই তাহা হইলে তুমি কি কর?"

সুরবালা নীরব। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। তাঁহার হৃদয় ভাবে পূর্ণ। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন,—

"কি যে করি তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেই দেবী, সেই প্রেমময়ী, সেই শক্তিময়ীকে আমার মন প্রতিদিন অবনত মস্তকে বার বার প্রণাম করিয়া থাকে। সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই—আহা বিধাতঃ, তুমি সকলই ঘটাইতে পার, এ অধীনার এ প্রার্থনা কি তুমি পূরণ করিতে পার না?—সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, যাঁহাকে প্রতিদিন ধ্যান করি—কল্পনায় যাঁহার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করি—আমার সেই দিদিকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহা হইলে—তাহা হইলে অভীষ্ট দেবতাকে সম্মুখে দেখিলে ভক্ত যাহা করে, আমিও তাহাই করি। তাহা হইলে স্বর্ণ সিংহাসন পাতিয়া তাঁহাকে আমার এই দেবতার পার্শ্বে বসাই, স্বহস্তে এই দেবযুগলের চরণ ধৌত করিয়া এই কেশরাশি দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করি এবং ভক্তি গদ্গদ হৃদয়ে দূরে দাঁড়াইয়া সেই দেবযুগলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করি। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি কখন আমার কপালে ঘটিবে?

রমাপতি মুগ্ধভাবে সুরবালার কথা শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, 'সত্যই কি সুরবালা মানবী? অস্থি, মাংস, বসা, চর্ম্মধারী মানবশরীর কখনই এবম্বিধ মহোচ্চ মনোবৃত্তির আধার হইতে পারে না। এই দেবীর বদনের ভাব, কথার প্রণালী, বাক্যের শক্তি আলোচনা করিয়া কে

বলিবে যে এ সকল উক্তিতে বিন্দুমাত্র কপটতা আছে ? কে বলিবে এই সকল ভাব এই দেবীর অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত নহে ?' তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমার যে এই দেবভাব, সুরবালা, মনুষ্যলোকে ইহার আর তুলনা নাই। মনুষ্যশরীর লইয়া তোমার এরূপ ভাব কেন হইল বহু আলোচনাতেও তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না।"

সুরবালা বলিলেন,—

"হৃদয়দেব! আমার এভাবে আমি বিস্ময়ের কারণ কিছুই দেখি না। দেবভাব কাহাকে বলে তাহা এ অধম নারী বুঝিতেও অক্ষম। আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই দিকে প্রধাবিত। যখন হইতে তুমি আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে আমার চক্ষে পড়িয়াছ, যখন তোমার পত্নীবিয়োগে বিজাতীয় কাতরতা আমি দেখিয়াছি, যখন তোমার সেই দারুণ দুর্বিপাক সময়ের কাহিনী সমস্ত তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তখনই তোমাকে দেবতা বলিয়া আমার ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ভক্তি তোমার দয়া, সরলতা, কোমলতা, বিদ্যা ও রূপ দেখিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন স্থানে উপনীত হইয়াছে যে আমার হৃদয়ে তাহার আর স্থান হয় না। তখন কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারিব, কিসে তোমার কাতর হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে পারিব, কিসে তোমার সেই শোকভারাবনত হৃদয়কে আনন্দময় করিতে পারিব, ইহাই আমার জীবনের চেষ্টা, লক্ষ্য, বাসনা এবং প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল। অন্য সাধ আমার জীবনে নাই। তোমার সুখ ভিন্ন, তোমার আনন্দ ভিন্ন, আমার প্রাণের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি দেবতা, আমি দেবসেবায় আমার দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছি। আমার আর স্বতন্ত্রতা নাই। সার্থক আমার জীবন, সার্থক আমার জন্ম। আমার দেবতা আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়াছেন; আমার প্রাণের প্রাণের বিরস বদনে এখন হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ তথায় এখন খেলা করে এবং সুখ তথায় এখন বিচরণ করে।"

তখন সুরবালা সেই নিশানাথবিরাজিত হৈমকরোজ্জ্বল গগনতলে

অশ্রুময় নয়নে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া উভয় বাহুতে রমাপতির পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমার ভক্তি ও মুক্তি, সুখ ও স্বর্গ, আশা ও সম্পদ সকলই তুমি। আমি তোমারই দয়ায়, তোমারই চরণপ্রসাদে ধন্য হইয়াছি। আমার দ্বারা—তোমার এই সামান্য দাসীর সামান্য সেবায় তোমার প্রাণে আবার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এ অধম দাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর কিছু প্রার্থনার আছে কি? তাই বলিতেছি, তোমারই চরণাশীর্ব্বাদে তোমার এ দাসী ধন্য হইয়াছে।"

তখন রমাপতি সেই স্থানে সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার লোচন দিয়া তখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। কোথায় এমন লোক আছে যে এমন অপার্থিব প্রেমের অধিকারী? এমন প্রেম স্বর্গেও আছে কি? এ সংসারে রমাপতি তুমিই ভাগ্যবান! সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"আমার যাহা ব্রত তাহার শেষ নাই—সীমা নাই। তোমাকে সুখী করাই আমার যোগ ও সাধনা। কিন্তু সুখের তো সীমা নাই। তোমাকে সুখী করিতেছি বটে, কিন্তু সুখের সর্ব্বোচ্চ সোপানে না উঠিতে পারিলে তোমার এ সেবিকার পরিতৃপ্তি নাই। যদি কখন দিদির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে আরও সুখী করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে। যদি নিজ প্রাণের বিনিময়েও সেই ভাগ্যবতীর সাক্ষাৎলাভ ঘটিত, তাহা হইলে তোমার দাসী এখনই তাহা সম্পন্ন করিত।"

তখন রমাপতি বলিলেন—

"সুরবালা, তোমার কামনা অতুলনীয়। জগতে এমন প্রেমের তুলনা নাই। তোমারই কৃপায় যে অভাগা ছিল সে এখন পরম ভাগ্যবান্। একদা এ হৃদয় সুকুমারীময় ছিল সন্দেহ নাই; এখনও হৃদয় যে সুকুমারীর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছে, এমন নহে, এবং কখন স্মৃতি হইতে সে মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু, সুরবালা, এখন তুমিই আমার জীবন ও মরণ, আশা ও নিরাশা, সম্পদ ও বিপদ সকলই। এ জীবন তোমারই

চেষ্টায়, তোমারই কৃপায়. তোমারই জন্য রক্ষিত। যদি, সুরবালা, যদি তুমি আমার এ শুষ্ক হৃদয়ে অজস্র ধারে শান্তিসুধা না সেচন করিতে, যদি তুমি এ দগ্ধ তরুতে প্রেমের কুসুম না ফুটাইতে, যদি তুমি এ অন্তর প্রান্তরে আনন্দের নদী না বহাইতে তাহা হইলে এতদিন আমার কি দুর্গতি হইত? যে দেবী আমার ন্যায় হীনজনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সুখসাগরে ভাসাইয়াছেন, তিনিই তাহাতে সকল প্রবৃত্তি সজীব রাখিয়াছেন। সুকুমারী, মৃত্যুকবলিত হইলেও, আমার হৃদয়ে তিনি যে এখনও বাঁচিয়া আছেন সে কেবল তোমারই যত্নে এবং তোমারই বাসনায়। আমি এখন যে প্রেমের অধিকারী, আমার সৌভাগ্যক্রমে যে আনন্দ-সাগরে আমি এখন ভাসিতেছি, মানবজন্ম লাভ করিয়া কেহ কখন কোথায়ও তাহা পায় নাই। এমন প্রেমে যে মত্ত, এমন সুখে যে ভাসমান, আর কোন স্মৃতিই তাহার থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহা তোমারই চেষ্টায় এখনও আমার হৃদয় ত্যাগ করে নাই। কিন্তু, সুরবালা, তুমি ভিন্ন এখন আমার গতি নাই। আমার হৃদয়ে যে সুকুমারী মূর্ত্তি আছেন তাহা তোমার দ্বারাই অণুপ্রাণিত, তোমার তেজে তাহা তেজোময়. তোমার প্রেমে তাহা প্রেমময়। এখন আমার সুকুমারী স্বতন্ত্র সুকুমারী নহে। এখন আমার সুরবালা ও সুকুমারী অভিন্ন ও এক। এখন সুরবালা যদি সুকুমারী না হয় তাহা হইলে তাহা লইয়া আমার একদিনও চলিবে না এবং যদি আমার সুকুমারী সুরবালাময়ী না হয় তাহা হইলে তাহা লইয়াও আমি একদিনও থাকিব না। অতএব দেবি, তোমার কৃপায় আমি আমার হারাধন সুকুমারীকে অনেক দিন পাইয়াছি। যাহার স্বতন্ত্রতা নাই তাহা স্বতন্ত্ররূপে পাইবার বাসনা কখন এ ভাগ্যবান্ মানবের মনেও হয় না।”

সেদিন আর যে সকল কথা হইল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ দম্পতী বহুক্ষণ প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য কালীর ফাঁসি। পূর্ব্ব দিবসেই আলিপুর জেলখানার প্রাঙ্গনে এই ভয়ানক ব্যাপার সংসাধনোপযোগী সমুদয় আয়োজন হইয়াছে। সেই জীবনান্তকারী প্রকাশ্যরূপে মানবপ্রাণবিনাশক ভয়ানক যন্ত্র, সদর্পে আপনার বিকট বাহু উত্তোলন করিয়া, দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বলোক সমক্ষে মনুষ্যঘাতক, অধম জীবিকাবলম্বী, হৃদয়হীন জল্লাদ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। স্বয়ং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত। আর উপস্থিত পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনিস্পেক্টর, সব ইনি-স্পেক্টর, কয়েকজন হেড কনষ্টেবল এবং অনেক কনষ্টেবল। লোকের জীবন রক্ষার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনান্ত সংঘটিত হইয়াছে কি না, তাহারই সমর্থন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ডাক্তার সাহেব উপস্থিত। সুতরাং ফাঁসির ঘটা খুব।

চারিদিকে অনেক লোক। লোকে প্রায় তাবৎ প্রাঙ্গন ছাইয়া গিয়াছে। অনেক লোক এই ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পাইয়া বাহিরে গাছের উপর ও অট্টালিকার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আগ্রহই বা কত। যেন আজি এখানে কি উৎসবই হইবে এবং তাহা দেখিতে না পাইলে তাহাদের জীবন ও জন্মই বিফলে যাইবে। ধন্য মানবের অদম্য কৌতূহল? যে ব্যাপার স্মরণে শরীর শিহরে, যে লোমহর্ষণকাণ্ড মনে করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং যাহার আলোচনা করিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই বিকট দৃশ্য দেখিবার জন্যও এত লোকসমারোহ হইয়াছে! একজন মানব—সজীব, সচল এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত মানব, রাজকীয় শক্তির বিরোধে প্রতিকূল চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে জানিয়া,যৎপরোনাস্তি অনিচ্ছাসত্বেও,অচিরে, অবনত মস্তকে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে; এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য তথায় লোকে লোকারণ্য। এরূপ বিসদৃশ দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ের কোমলতা বিধ্বংসিত এবং পরুষতা সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

তবে জগতের কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণকর নহে। নিপাতকারী হলা-হলেরও রোগাপনোদনের শক্তি আছে। তাদৃশ চক্ষে এ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হইতে পারে যে, এতাদৃশ ব্যাপার সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ করিলে, দর্শকের হৃদয়ে উপস্থিত দৃশ্য নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ী অঙ্কপাত করে এবং তাহাতে সমাজের প্রভূত হিত সংসাধিত হয়। কিন্তু যাহারা এই জন্য প্রস্তুত হইয়া, যাতায়াত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হয় ত কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় সময়নাশ ও কার্য্যক্ষতি করিয়া এই কাণ্ড দেখিতে যায়, তাহাদের কেহই, ইহার ফলস্বরূপে পরিণামে সমাজের হিত সাধিত হইবে, বা হৃদয়ে স্থায়ী অঙ্কপাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়া কখনই যায় না। সুতরাং নিতান্ত জঘন্য কৌতূহল নিবৃত্তি ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মনুষ্য যে পশুরই রূপান্তর এবং মানব হৃদয় যে এখনও পাশব প্রবৃত্তির নিতান্ত বশীভূত এইরূপ নিষ্ঠুরতায় উৎসাহ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর অল্পকাল পরেই কালীকে ঐ সম্মুখস্থ মরণযন্ত্রে লম্বিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। রোগ বা কোন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে না। মানব আত্মকৃত ব্যবস্থা-বলে, প্রকাশ্যরূপে বলপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিবে। যে অত্যুৎকট অচিন্তনীয় পাপে তাহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, যে নৃশংস কার্য্য সমাধা করিয়া সে সমাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছে, মানব তাহার শাস্তিস্বরূপে এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সমাজ সংস্থিতির জন্য পাপীর শাস্তি বিধান নিতান্ত আবশ্যক। সংসারের পাপস্রোত মন্দীভূত করিবার জন্য পাপাসক্তের বিহিত দণ্ড সতত ও সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয়। কালীর পাপানুরূপ শাস্তি প্রয়োগের অভিপ্রায়েই আজি তাহাকে বিগতজীব করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। মানবকৃত বিধিব্যবস্থায় ইহাই তাদৃশ মহাপাপীর চূড়ান্ত শাস্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে। কেহ কেহ এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপে প্রাণনাশ করিলেই কি এতাদৃশ ঘোর পাপীর পাপোচিত শাস্তি হইয়া থাকে? তাঁহারা বলেন ভোগের পরিমাণানুসারে শাস্তির গুরুতা ও

লঘুতা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কালীর ন্যায় পাপীয়সীর বহুকাল ধরিয়া শাস্তি ভোগ করা আবশ্যক এবং সে শাস্তির জ্বালা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে ও হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যাওয়া আবশ্যক। যতদিন সে বাঁচিবে ততদিন কদাচ যাহাতে এ শাস্তির কথা, ইহার যন্ত্রণার স্মৃতি, সে একবারও ভুলিতে না পারে, এমন কোন সাজা তাহার ন্যায় পাতকীর জন্য নির্দ্ধারিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অধুনা তাহার নিমিত্ত যে শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে, বলিতে গেলে, তাহা কেবল দুই মিনিটের শাস্তি। কয়েকদিন —সত্যই কয়েকটী দিনমাত্র দণ্ডিত ব্যক্তি একটা দুরন্ত বিভীষিকায় উৎপীড়িত হয় বটে, কিন্তু তাহার পর দুই মিনিটে—কেবল ক্ষুদ্র দুই মিনিটের মধ্যে তাহার সকল বিভীষিকা ও শাস্তির অবসান হইয়া যায়। এত বড় অপরাধী কেবল দুই মিনিটের শাস্তি ভোগের পর সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করে এবং তখন সে মানব সমাজের তিরস্কার ও পুরস্কার, আনন্দ ও বিষাদ, সম্পদ ও বিপদ, সুখ ও দুঃখ, জ্বালা ও শান্তি, হাস্য ও রোদন সকল বিষয়েরই হাত ছাড়াইয়া যায়। এরূপ দুষ্কৃতির সহিত তুলনা করিলে তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক প্রভৃতির অপরাধ নিতান্তই লঘু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাদেরও বহুকাল ধরিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, অথচ এমন ভয়ানক পাপী কয়েকদিনের ভয় ও দুই মিনিটের যাতনা ভোগ করিয়া, আমাদের হাত হইতে পার পাইয়া যায়, ইহা বস্তুতই নিতান্ত হাস্যজনক অব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালী যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে দুই মিনিটের বেশী শাস্তি ভোগ করিতে হইল না সত্য, কিন্তু সে মানব হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গেল, লোকসমূহকে যে শিক্ষা দিয়া গেল তাহার জন্য চিরদিনই সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কথাটা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কারণ মরণের অপেক্ষা মরণের ভয়টা বড়ই ভয়ানক। কালী মরিয়া নিজে যত যাতনা ভোগ করুক না করুক, তাহার এইরূপ মৃত্যু দেখিয়া লোকের মনে এইরূপ কার্য্যের এই ফল বলিয়া, যে এক ভয় ও সাবধানতা জন্মিবে, সমাজের পক্ষে তাহা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু তাহাতে কালীর কি? তোমার কল্যাণ বা অকল্যাণ কালী তো আর

দেখিতে আসিবে না; তাহার এত বড় পাপে তোমরা যে দুই মিনিটের শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ তাহার যুক্তি কোথায়? কেন, তাহার অপরাধের অনুরূপ সাজা কি তোমরা দিতে জান না? একটা বেগুন চুরি করিলে তোমরা তাহার নাকে দড়ি দিয়া ঘানিতে ঘুরাইতে পার, আর এইরূপ পতিহন্ত্রীকে দুই মিনিটের বেশী সাজা দিতে পার না? পরকালে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া সাজার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে তোমার কোন অধিকার নাই; কারণ পরকালে কি হইবে তাহা জানিতে তোমার হাইকোর্টের জজদেরও কোন ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ জানে না ও বুঝে না তাহা হিসাবে ধরা যায় না। সুতরাং পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, ফাঁসির পূর্ব্বে কয়দিনের ভয়ই ইহকালে কালীর দণ্ডের প্রধান অংশ। কিন্তু এই কি সাজার চূড়ান্ত? ইহার চেয়ে কঠিন সাজা কি আর হইতে পারে না? অবশ্যই কঠিনতর সাজা উদ্ভাবিত হইতে না পারে এমন নহে। যেমন অপরাধ তাহার তেমনই দণ্ড হইলে লোক-শিক্ষারও ব্যাঘাত হইবে না এবং ন্যায়েরও সম্মান রক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ ইহার অপেক্ষা আরও এক শক্ত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, যাহা তুমি দিতে পার না তাহা লইবার তুমি কে বাপু? তোমার শত শত জজ, শত শত আদালত, শত শত পার্লেমেণ্ট এবং শত শত রাজারাণী মিলিয়া, শত শত বৎসর ভাবিলেও, একটা মানুষ তৈয়ার করিবার আইন করিতে পারেন কি? তাহা পারেন না। যাহা গড়িবার তোমাদের ক্ষমতা নাই, তাহা ভাঙ্গিতে তোমরা এমন তৎপর কেন? এমন করিয়া আইনের দোহাই দিয়া, নিয়ত মানুষ খুন করিতে তোমাদের অধিকার কি?

কেহ কেহ আরও একটা গুরুতর কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন যাহারা একবার পাপ করিয়াছে তাহারা কি আর কখন ভাল হইতে পারে না? একবার যাহার পদস্খলন হইয়াছে, আবার কি সে সাবধান হইয়া চলিতে পারে না? যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ভাবিয়া দেখ, এরূপ অন্যায় নরহত্যায় জগতের যে কত সর্ব্বনাশই ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হয়ত সেই মহাপাপী, বাঁচিয়া

থাকিলে, হৃদয়ের এমন উন্নতি করিতে পারিত, হয়ত সে সংসারের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির এমন সহায় হইত যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি তাহার অপরাধানুরূপ ভাল শাস্তি দিতে পারিলে না, অথচ তাহার আত্মোন্নতি সাধনের কোন সুযোগ করিতে দিলে না, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহাকে অবসর দিলে না এবং তাহার দ্বারা যদি জগতের কোন হিত সঙ্ঘটিত হইতে পারিত তাহাও হইতে দিলে না। ইহার নাম বিচার না বিচারের ব্যভিচার ?

কিন্তু আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথায় বহুস্থান ব্যয় করিয়াছি। ফাঁসি বিধেয় হউক না হউক, কালীর আজি ফাঁসি। সব প্রস্তুত, নির্দ্ধারিত সময়ও প্রায় উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একবার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন ; তাহার পর জেলখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কারাগারের সেই লৌহদ্বারের মধ্য হইতে বহু কনষ্টবল এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। চারিদিক হইতে 'আসিতেছে, ঐ আসিতেছে,' শব্দ উঠিল। ক্রমে, পশ্চাদ্দিকে হাতকড়ি দ্বারা নিবদ্ধহস্ত, আসামী ও কনষ্টবলগণ বধ্যভূমির নিকটস্থ হইল, অতি নির্ভীক পাদবিক্ষেপে, সেই লোকসমুদ্রমধ্যে অবগুণ্ঠনবতী অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আইন অনুসারে এখনই তোমার ফাঁসি হইবে, তাহা তুমি জান। এখন তুমি কিছু বলিতে চাহ কি ?"

কনষ্টবলগণ চারিদিকের কোলাহল নিবারণের জন্য "চুপ্ চুপ্" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সমাগত লোক সকল রুদ্ধনিশ্বাসে হত্যাকারিণী কালীর উত্তর শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন কালী অতি মধুর, কোমল ও ভীতিশূন্য স্বরে উত্তর দিল,—

"আমার অঙ্গে করস্পর্শ না হয় এইরূপ ভাবে একবার আমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর বাসনানুযায়ী আদেশ করিলে একজন কনষ্টবল সাবধানতা সহ তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। কিন্তু একি ?

এ যে সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা! ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। রমণী সুন্দরীর শিরোমণি। সুন্দরী ধীরে ধীরে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার নিষ্পাপ বদনশ্রী, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অপার্থিব সৌকুমার্য্য দেখিয়া দর্শকগণ অবাক হইল। সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জলতায় সেই ঘৃণিত বধ্যভূমিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই ঘোর বিস্ময়াকুল! তখন জজ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে কাণে বলিলেন,—

"একি এ? আমি যে আসামীর উপর ফাঁসির হুকুম দিয়াছি, কখনই সে নহে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,

"তাইত, আমি যে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

পুলিস সাহেব মাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন,—

"আমি যে আসামীকে দুই তিন দিন হাজতে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—

"আমি যে আসামীর জবানবন্দী লইয়াছি এবং বার বার দেখিয়াছি এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখন উপায়?"

জজ সাহেব বলিলেন,—

"আপাততঃ ফাঁসি বন্ধ রাখিয়া তদারক করা আবশ্যক।"

তখন সুন্দরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি ফাঁসিকাঠে এখন উঠিব কি?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—

"না, তোমার ফাঁসিতে উঠিতে হইবে না। তুমি যে এ মোকদ্দমার আসামী কালী নহ তাহা স্থির। কালী কোথায় এবং তাহার কি হইয়াছে তাহা তুমি অবশ্যই জান। তুমি কালীকে বাঁচাইবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে আইনের চক্ষে তোমার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ

ঘটিয়াছে। এখনই তোমার অপরাধের যথাবিহিত তদারক হইবে। তাহার পর তোমার বিচার হইয়া শাস্তি হইবে। আপাততঃ কনষ্টবলেরা তুমি যেখানে ছিলে, সেখানেই তোমাকে রাখিয়া আসুক।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ আদেশ দিলে কনষ্টবলগণ আবার সেই সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া জেলে ফিরিল, তাহার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব এবং ইনিস্পেক্টর বাবুও চলিলেন।

ফাঁসি বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা বড় সাধ করিয়া ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। বাটী ফিরিবার সময় লোকে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—“কালী অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানিত। সে মন্ত্রের জোরে চেহারা বদলাইয়া ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া গেল।” কেহ মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—“আরে নাহে না, তাকে ফাঁসি দেওয়া ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা নয়। দেখিলে এক নজরায় সকলের মুণ্ড ঘুবাইয়া দিল।” আর একজন বলিল,—“এ সকলই দেবতার কৃপা। দেবতা নহিলে এমন করিয়া বাঁচাইতে পারে কে? দেখিলে না মেয়েটার চেহারা? মানুষের কি কখন এমন চেহারা হয়?” কেহ বলিল,—“দাদা, ঐ যে পুলিস, ওদের পায়ে নমস্কার। এ সকলই জানিবে পুলিসের খেলা। পুলিস টাকা খাইয়া এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। তাহা না হইলে যেখানে মাছিটী পর্য্যন্তও যাইবার যো নাই সেই জেলখানার ভিতরে এমন কাণ্ড ঘটায় কে?” মীমাংসা নানারূপ। ক্রমশঃ।

অতৃপ্তি।

১

[illegible] বারে বুঝি [illegible]—
বুঝি [illegible]।
আর চাহি না তোমারে বঁধু
[illegible]।
[illegible] তোমারে চেয়ে,
[illegible] তোমারে পেয়ে,
[illegible] বেদনা [illegible]
[illegible]—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে।

[illegible]

আর চাহি না তোমারে বঁধু
[illegible]

২

ওগো [illegible]
[illegible]নে,
হায় [illegible]
[illegible];
প্রাণের [illegible]
কেঁদে [illegible]
যৌবনের সমাধি [illegible]
[illegible]—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে।

৪

ওগো জীবন [illegible]
[illegible]
মরণ [illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible]—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে।

শ্রী [illegible] ভট্টাচার্য